~~10.66~~ ~~Sr.~~ ~~4571~~

~~616~~

2y

বনফুল-কে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

“এই লেখকের অন্য বই”

ওগো মেয়ে সাবধান ॥ স্বামীপালন পদ্ধতি ॥ সালোম ॥ ভাঙাগড়া ॥
ভ্যাগাবণ্ডস ॥ পংকিল ॥ কটাক্ষ ॥ থেলমা ॥ ক্যাসন ট্রেনিং স্কুল ॥
ফাঁকিস্থান ॥ চক্র ॥ ম্যানিয়া ॥ বেন-হুর ॥

পুরুষের কাছে তুমি নিতান্ত পণ্যা,
অন্যায়ে নুয়ে থাকা, তুমি সেবা-ধন্যা।

এই কাহিনী বাস্তব অভিজ্ঞতায় রচিত হলেও, এর চরিত্রগুলি নিছক কাল্পনিক। খাসিয়া কথাগুলির বাংলা অনুবাদ বইয়ের শেষে দেওয়া রইলো।

৫।৪।৫৪ কুমারেশ ঘোষ।

প্রায় সাত বছর পরে মণিলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হঠাৎ।

শিলংএ পুলিশবাজারে যাবার পথ খুঁজতে গিয়ে খোঁজ পেলুম মণিলালের।

বিকেল বেলা। স্যুট পরা, গায়ে ওভারকোট, মাথায় টুপি, মুখে চুরুট এক ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম : মশায়, পুলিশবাজারে যাবার পথটা—হঠাৎ চিনতে পেরে চেঁচিয়ে বললাম : আরে, মণিলাল তুমি ?

আরে তুমি এখানে ? মণিলাল আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরলো : ওঃ, কতদিন বাদে দেখা—

তা প্রায় সাত বছর হবে। বললাম।

চলো চলো—মণিলাল আমার হাত ধরে টানলো : আর পুলিশ বাজারে গিয়ে দরকার নেই, আমার বাড়ীতে চলো।

মণিলালের সঙ্গে গল্প করতে করতে চললাম। কথায় বুঝলাম : বেশ উন্নতি করেচে। আসাম সরকারের সে একজন গণ্যমান্য কর্মচারী। কারখানা দেখে বেড়ানো আর রিপোর্ট লেখা তার কাজ। যে কোন একটা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি নির্ভর করে নাকি মণিলালের কলমের লেখার উপর। বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসে শিলংয়েই সে চাকরি পেয়েচে।

বিয়ে করেচে বছর পাঁচেক হ'লো। দুই ছেলে এক মেয়ে।

মণিলাল আর আমি একসঙ্গে বি, এস্, সি পাশ করি। পরে মণিলাল গেল বিলেতে, আমি দেশেতেই থাকলাম চাকরীর চেষ্টায়। সেই থেকে মণিলালের সঙ্গে দেখা নেই।

প্রায় সাত বছর পরে শিলংএ হঠাৎ মণিলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

প্রভা শীগ্রী বাইরে এসো—বাড়ী ঢুকে মণিলাল হাঁকডাক আরম্ভ করে দিলো ঃ দেখো একবার কাকে ধরে এনেচি।

হয়তো কেউ জানা লোক ভেবে মণিলালের বৌ ছুটে এসেছিলো বাইরে, কিন্তু যখন দেখলো অচেনা কে একজন তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে—সে অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে তাড়াতাড়ি পালাতে যাচ্ছিল, এমন সময় মণিলাল তার আঁচল চেপে ধরলো ঃ আরে, যাচ্চো কোথায়? এ যে আমার বন্ধু! সাত বছর পরে দেখা। তোমাকে চেনবার আগে একেই চিনতাম বেশি।

এখন যদিও কেউ কাউকে হঠাৎ চিনতে পারি না। আমি হেসে বললাম।

তা যা বলেচো! বৌকে বললো ঃ আমার খাবার কোথায় আনো, আজ দুজনে ভাগ করে খাবো।

প্রথম লজ্জা সামলে নিয়ে, ফর্সা, ছিপছিপে মণিলালের বৌ খাবার নিয়ে এলো। জিগ্যেস করলাম ঃ ছেলে মেয়েরা কোথায়? দেখচি না যে?

ঐদিকের এক বাড়িতে বেড়াতে গেচে। মণিলালের বৌ বললো।

মণিলাল বললো ঃ তুমি ভাই যে কদিন আছো আমার এখানেই থাকো।

হেসে বললাম ঃ পয়সা দিয়ে হোটেলে থাকার চেয়ে বিনা পয়সায় বন্ধুর ঘাড় ভেঙে থাকা, তার উপর ঠাকরুণের আদর যত্ন—আমার মত পরস্মৈপদী লোকের কোন আপত্তি নেই, তবে দুঃখু এই এ সুখ বেশিদিন ভোগ করা যাবে না।

কেন ?

দিন সাত-আটের মধ্যে ফিরতে হবে। এর মধ্যে এখানকার সব দেখে নিতে চাই।

এখানে কি আর আছে দেখবার ? মণিলাল বললো : কেবল উঁচু নীচু রাস্তা, পাইন গাছ আর কাঠের বাড়ী। হ্যাঁ, গলফ্ গ্রাউণ্ড আছে বটে দেখবার। আর আছে—মণিলাল বৌকে বললো : রাগ করোনা প্রভা—আমায় বললো : আর আছে দেখবার এখানকার মেয়েমানুষ।

প্রভা গম্ভীর হ'য়ে থাকলো। আমি হাসলাম : তার মানে ?

তার মানে—ওদের স্বাস্থ্য দেখেচো ? মণিলাল বললো : দেখেচো ওদের পায়ের গোছা, এক লাথি খেলে তোমার আমার মত পুরুষকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

প্রভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মণিলাল হাসলো : লাল টকটকে আপেল দেখেচো তো ? এদেশী মেয়েরা হচ্চে তাই। সুন্দরী—কিন্তু শক্তি আছে। আর আমাদের মেয়েরা ? যেন গোলাপ ফুল। রূপ আছে, গন্ধ আছে, মানে গুণ আছে—কিন্তু বড় দুর্বলা ; একটুতেই ঝরে যায়।

আমাদের খাওয়া হ'য়ে গেল। ঠিক হলো রাত্রেও মণিলালের ওখানেই খেতে হবে ; আর পরদিন সকালে বাক্স-বিছানা নিয়ে আসতে হবে তার বাসায়।

দুজনে বেরোলাম পুলিশবাজারের দিকে। অনেকদিন পরে দুজনে পুরোন দিনের গল্প করে সময়টা কাটালাম আনন্দেই।

খানিক পরে মণিলাল বললো : চলো এবার যাওয়া যাক্।

জিগ্যেস করলাম : কোথায় ?

ভূতের কেত্তনে যোগ দিতে। মণিলাল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো।

তার দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম : তার মানে ?

তার মানে বুঝবে পরে। চলোই না। অগত্যা মণিলালের সঙ্গেই চলতে হলো।

খানিকটা চলবার পর আমরা ঢুকলাম এসে একটা হোটেলে। খাসিয়া হোটেল। ঘরের কোনে একটা খালি টেবিলের ধারে এসে বসতেই একটী খাসিয়া মেয়ে এসে দাঁড়ালো। মণিলাল তাকে খাসিয়া ভাষায় বললো : কা খুন্না বাভা, ওয়ালাম শা।

জিগ্যেস করলাম : কি বললে ?

বললাম, লক্ষ্মী মেয়ে, চা নিয়ে এসো।

মণিলাল সিগ্রেট বার করলো : দেবো একটা ?

দিতে পারো। তবে অভ্যেস নেই। সিগ্রেট নিয়ে ধরালাম : খাসিয়া ভাষা শিখলে কবে ?

এখানে এসে। মণিলাল সিগ্রেট ধরিয়ে একটা টান দিলো।

একটু পরেই খাসিয়া মেয়েটী আমাদের জন্যে দুকাপ চা নিয়ে এলো। মণিলাল এবার মেয়েটীকে হুকুম করলো : ওয়ালাম কিয়াড্।

মেয়েটী মণিলালের দিকে কটাক্ষ হেনে, মুখ টিপে হেসে চলে গেল ভিতরে। একটু পরেই আমাদের টেবিলে নিয়ে এলো, একটা মদের বোতল আর গ্লাস।

আশ্চর্য হয়ে জিগেস করলাম : একী? এসব কবে ধরলে? বিলেত থেকে এইসব শিখে এসেচো বুঝি?

খাসিয়া মেয়েটী তখন মদের বোতল খুলে গ্লাসে মদ ঢালছিলো। মণিলাল হেসে বললো : বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যেই শিখে এসেচি, কিন্তু এ বিদ্যে শেখা এখানেই।

কেন মণি?—আমি উদ্বেগ প্রকাশ করলাম : এ সর্বনেশে নেশা তোমায় পেয়ে বসলো কেন?

মণিলাল হাসলো : তুমি হয়তো ভাবচো, ইচ্ছে করেই এ নেশা করতে ধরেচি? না ভাই, তা' নয়।—মণিলাল এক চুমুক মদ খেলো : জানি আমি এ নেশা সর্বনেশে। তবু আমায় এরই আশ্রয় নিতে হয়েচে।

কেন? জিগ্যেস করলাম।

ঐটী জিগ্যেস করো' না ভাই, আমার বিনীত অনুরোধ। মণিলাল আবার মুখে মদের গ্লাস ওঠালো।

কী ব্যথা মণিলাল পেয়েচে? কী বেদনা তার মনে আছে? সরকারী চাকরি, সংসারী বৌ, আদরের ছেলেমেয়ে, স্বাস্থ্য-ভরা দেহ—সবই তো মণিলাল পেয়েচে। অথচ কী পায়নি সে—অথবা কি দুঃখ সে পেয়েচে—যা ভোলবার জন্যে ঐ সর্বনেশে নেশার সাহায্য নিতে হয়েচে!

মণি!

কেন?

তুমি মদ খেয়ো না।

বাধা দিওনা ভাই!

কিন্তু বাধা দেওয়াই কি আমার কর্তব্য নয় ?

মণিলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে খাসিয়া মেয়েটীকে ডেকে তাদের ভাষায় কী যেন বললো।

আবার কী বললে ?

এক ডিস মাটনকারি আনতে—মণিলাল আরো খানিকটা মদ খেলো : আমার খাবার থেকে আদ্ধেকটা তোমায় দিতে হ'লো তাই খিদে যায়নি ঠিক। তোমার জন্যে আনতে বলবো ?

না, হেসে বললাম : তুমি এতো খোলাখুলি কথা বলতে শিখলে কবে !

মণিলাল হাসলো : খোলাখুলি ! মণিলালের কথায় জড়তার ভাব এসেচে : খোলাখুলি কথা বলাই কি ভালো নয় !

ভালো বৈকি !

তবে ! খাসিয়া মেয়েটী কারি এনে দিলো। মণিলাল খানিকটা খেয়ে বললো : তবে কেন বলবোনা—কেন বলবো না খোলাখুলি কথা ? বলো ? বলো বন্ধু ! আমি কাউকে ভয় করি ? কাউকে না !—মণিলাল একচুমুক মদ খেলো : বৌকে না, বন্ধুদের না, অফিসের সাহেবদের না, দেশের লোকদের না—কাউকে—কাউকে আমি ভয় করিনা। বুঝেচো ? দেশের লোকেরা কি বলে জানো ? মণিলাল আমার দিকে চেয়ে ফিকে হাসলো।

কী বলে তারা ? আমি জিগ্যেস করলাম।

তারা বলে—মণিলাল জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলো। তারা বলে বড় মজার কথা। এখানে আসে তারা হাওয়া খেতে—কিন্তু হাওয়া খেয়ে থাকা যায় কি ?

তা তো যায়না।

তাই আমার বাড়িতে দু'বেলা চোব্যচোষ্য খায় আর থাকে। বুঝেচো? খায় আর থাকে। শেষে কি হয় জানো?—মণিলাল দুহাত উঁচু করে দেখালো: হ'য়ে যায় হাতি। মানে—বেড়াল ছানাটি হয়ে আসে, আর হ'য়ে যায় ইয়া মোটা হাতি। হাতি দেখেচো তো? তারপর দেশে গিয়ে কি বলে জানো? বলে: মণিলাল মেয়ে মানুষ রেখেচে।

সত্যি নাকি?

হ্যাঁ হ্যাঁ রেখেচি আমি মেয়েমানুষ—মণিলাল বললো: আমি নিজের পয়সা দিয়ে রেখেচি। বুঝেচো? আমি কি তাদের পয়সা দিয়ে রাখতে গেচি?

কিন্তু—আমি তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম: ঘরে বৌ থাকতে বাইরে অন্য মেয়েমানুষ রাখা কি ভালো মণি? লোকে তো খারাপ বলবেই। আর তোমার বৌয়ের মনেও তো কষ্ট হয়।

বৌ! মণিলাল আর এক ঢোঁক মদ খেয়ে বললো: এই ফুর্তির সময় বৌ-এর কথা ব'লোনা। ঐ বৌ-এর জন্যই—থেমে গেল মণিলাল।

কেন? বৌ কী করলো?—খোঁচালাম আমি।

চুপ! ধমক দিল মণিলাল: কায়দা ক'রে কথা বার করা?

আমার বয়ে গেচে তোমাদের কথা শুনতে।

ও, অমনি রাগ? মণিলাল নরম হ'লো: ওসব শুনে তোমার লাভও নেই। বরং কষ্ট পাবে। ওর চাইতে একটু হবে নাকি? খাবে? ম্যাড খিনডিয়েট?

না!

ও, গুড বয়। বেশ এবার তবে ওঠা যাক। মেয়েটিকে ডাকলো মণিলাল: আলে রুই, কা খিন্না। আয়না ছুঁড়ি তাড়াতাড়ি!

খাসিয়া মেয়েটি কাছে এলে তাকে বাংলায় বললোঃ যতো হ'লো লিখে রাখ্। বেশী লেখাসনে যেন! তা'হলে মেরে ফেলবো। যাঃ!—

মণিলাল টেবিলের উপর ভর দিয়ে উঠলো। চলতে গিয়ে পা দুটো তার টলতে লাগলো। প'ড়ে যাবে ভেবে ধরতে গেলাম—মণিলাল ব'লে উঠলোঃ ভেবেচো মাতাল হ'য়েচি ধূর! রোজ এ শর্মারামকে কে ধরতে আসে?—তুমি? ছেড়ে দাও ব্রাদার, ছাখো কেমন জনি-ওয়াকারের মতো চলবো। মণিলাল আমার হাত সরিয়ে দিয়ে রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে চলতে লাগলো!

তুমি জানো না বুঝি? মণিলাল বললোঃ আমি মদ খাই বটে, কিন্তু মদ আমাকে আজও খেতে পারেনি। হোটেলে মাপ বলা আছে, হুঁ হুঁ বাব্বা, সেদিকে ঠিক আছি। বলা আছে—তার বেশি চাইলেও যেন না দেয়। দিলেও পয়সা পাবে না। তাইতো এ অবস্থায় পয়সা দিইনে। চালাকি নয়। এ বাবা শ্রীমান মণিলাল মুখুজ্জে।

মণিবাবু যে! একজন ভদ্রলোক মণিলালকে দেখে হেসে ডাকলেন।

মণিলাল নিজেকে দেখিয়ে বললোঃ এ মণিবাবু নয়, ইনি হচ্চেন শ্রীমান মণিলাল মুখুজ্জে। আমাকে দেখিয়ে বললোঃ আর ইনি হচ্চেন আমার মোষ্ট ইন্‌টিমেট ফ্রেণ্ড, মাই বুজম্ ফেণ্ড, মাই—বুয়েচেন?

আজ মাত্রাটা একটু বেশি হ'য়েচে বুঝি? ভদ্রলোক মুচকে হেসে বললেন।

হ'তে পারে। মণিলাল বললোঃ নিজের পয়সায় খাওয়া—মাত্রাজ্ঞান নাও থাকতে পারে। বাই বাই!

ও ভদ্রলোক কে ? জিগ্যেস করলাম।

মণিলাল বললো : ও একজন ভদ্দর লোক—অতি ভদ্দর লোক—অতি ভালো লোক—অতি সাধুলোক—অতি ধাম্মিক লোক। কেন জানো ? আমার মতো ও সবার সামনে মদ খায় না। বুঝেচো ? আমার মতো নিজের পয়সায় মদ খায়না। বুয়েচো ? তাই ও সাধুলোক—আর আমি বেটা মাতাল, আওরিয়া খ্লেম রেইন ?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। দু'জনে চলতে চলতে শিলংএর এক নির্জন পাড়ায় এসে পড়লাম। রাস্তার আলোতে ঘড়িটা দেখলাম রাত্রি তখন সাড়ে আটটা।

রাস্তাটা ক্রমেই উঁচু হয়ে গেচে। রাস্তার মাথায় কাঠের বাড়ি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আছে। কেবল কাঁচের জানলা দিয়ে ঘরের আলো যাচ্চে দেখা, যেন তরুনীর কালো খোঁপায় সোনার ফুল। কোয়াশার ভিতর দিয়ে এখানে সেখানে ছড়ানো আলোগুলি রহস্যময়।

শীতের রাত্রি। রাস্তায় বেশি লোক চলাচল নেই। পাথরের গুঁড়ো ছড়ানো রাস্তা দিয়ে মণিলাল অসংযমী পায়ে বেসুরো আওয়াজ করতে করতে চললো। মুখে তার অসংলগ্ন, অশ্লীল ভাষা; আর তারই সঙ্গে চলেচি নীরব, লক্ষ্যহীন আমি।

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকলো : মণিবাবু! মণিবাবু! দাঁড়ান একটু।

কে বাওয়া ? মণিলাল দাঁড়িয়ে জড়িত স্বরে বললো : যাবার বেলায় পিছু ডাকো—কে গো তুমি ?

আজ্ঞে আমি! একজন ভদ্রলোক কাছে এসে দাঁড়ালেন। মুখে তাঁর উদ্বেগের চিহ্ন।

মণিলাল, ভদ্রলোকের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা ক'রে বললো : এ তো বাওয়া চিনতে পাচ্চিনে। পরে আবার সুর ধরলো : কে তুমি—কে তুমি কহিছ সবারে, সবারে বাসিতে ভালো! এই মিয়েতে লেইত করতে ?

মণিলালের কাণ্ড দেখে হেসে বললাম : কেউ তোমাকে ভালবাসতে বলচে না।

মণিলাল আমাকে থামিয়ে দিলো : কেন? প্রে তো আমাকে, আইমিন্ কাপ্রেসিনা তো আমাকে ভালবাসতে বলে, চালাকি নাকি ?

ভদ্রলোক এবার করুণ স্বরে বললো : আমি বঙ্কু দাস, গেঞ্জীকলের প্রোপ্রাইটর। আপনার বাড়িতে গেছলাম। সেখানে বসে থেকে থেকে চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় পথে আপনার খবর পেয়ে ছুটে আসচি। ভদ্রলোক পকেট থেকে কী যেন বার ক'রে মণিলালের হাতে গুঁজে দিয়ে বললো : কাল দয়া করে রিপোর্টটা একটু ভাল করে লিখে দেবেন, নইলে গরীবের কারখানাটা উঠে যাবে। আশা করি—

আর আশা করতে হবেনা, বুয়েচো মশায়! মণিলাল বললো : ভেবেচো মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছি, টাকা দিলেই কাজ্জোদ্ধার হয়ে যাবে! ঘুঘু দেখেচো ফাঁদ দেখোনি, হুঁ হুঁ বাব্বা! মণিলাল নোটগুলো রাস্তার ছড়িয়ে দিলো : কেটে পড়ো বাওয়া। ঘুসের টাকা কুড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ো মশায়; নইলে মারবো এমন ঘুঁসি—মনিলাল শূন্যে একটা ঘুঁসি চালালো। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে একবার ঘুরে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলো আমি তাকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললাম।

হুঁ হুঁ বাব্বা! মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে আমার কাঁধে ভর দিয়ে নিজের মনে বলতে লাগলো : চালাকি নাকি? এ বাওয়া শ্রীমান

মণিলাল মুখুজ্জে, ঘুসের বদলে ঘুঁসি মারে! ব্যাটা টাকা দেখাতে এসেচে।

ভদ্রলোক বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে সরে প'ড়লেন।

কিছুক্ষণ বাদে আমরা এসে পড়লুম খাসিয়া পাড়ায়।

নোংরা, অন্ধকার, দুর্গন্ধময় গলির শেষে একটা কাঠের মাটকোঠার সামনে মণিলাল দাঁড়ালো।

এখানে দাঁড়ালে যে?

ঐ যে সিঁড়ি!

উপরে উঠবে? বাড়ি যাবে না?

ঐ তো বাড়ি। হোম্—স্থইট্ হোম্!

তোমার বাড়িতে যাবে না?

এই তো আমার বাড়ি, হ্যাঁ আমার বাড়ি। এ বাড়ির ভাড়া আমি দিই—বুঝেচো? প্রের খাওয়া-পরা, হাত খরচ, আমি দিই—আমি। মণিলাল চীৎকার ক'রে ডাকলো: প্রে—কাপ্রে—কাপ্রেসিনা। কং—কং জল্‌দি আউ। আলে ক্লয়।

কং আবার কে? জিগ্যেস করলাম।

দিদি—দিদি। মণিলাল বললো: কং মানে দিদি—প্রের দিদি। বড়ো গরীব কিনা—বুঝেচো; কাজেই তারও ভাত কাপড় আশ্রয় আমাকেই—বুঝেচো কিনা?

তা এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচালেই কি চলবে? বললাম: ওরা হয়তো শুনতেই পায়নি!

শুনতে পারনি মানে? মণিলাল ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালো: নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েচে, আলবাৎ শুনতে পেয়েচে, ওদের বাপ-চোদ্দ পুরুষ শুনতে পেয়েচে—বুয়েচো?

হ্যাঁ বুঝেচি।—ওসব অবুঝের কাছে অবুঝ হওয়ার চাইতে বোঝার ভান করাও ভালো; কিন্তু মণিলাল ছাড়বার পাত্র নয়। বললো: কি বুয়েচো? ঘোড়ার ডিম বুয়েচো, কিস্সু বোয়োনি! দুবোনে লেপের মধ্যে জড়াজড়ি হয়ে ঘুমের ভান ক'রে মট্‌কা মেরে পড়ে আছে—বুয়েচো? পাছে শীতে বেরুতে হয় তাই! বাছাধনেরা ঘুঘু দেখেচে ফাঁদ দেখেনি!—চলো, উপরমে চলো, লাথি মেরে দর্জ্জা ভেঙে কোমর ভাঙবো ছুঁড়ির!—এই প্রে, কাপ্রে—

আবার মণিলাল ষাঁড়ের মত চীৎকার করলো। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া নিঝুম পাড়াটা মণিলালের কর্কশ চীৎকারে হঠাৎ গম্ গম্ করে উঠে আবার মিইয়ে গেল। গলির ভিতর দিয়ে ব'য়ে গেল এক ঝলক ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া। সামনে পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলো থেকে জলচে মিটি-মিটি আলো; মাতাল মণিলালের কাণ্ড দেখে হাসচে নাকি?

মণিলাল বললো: এই আমার হাত ধর্, আমার হাত ধ'রে সখা নিয়ে চলো মোরে, আমি তো ও পথ, বুয়েচো কিনা—আমি তো ওপথ, বিপথ, কুপথ চিনি না—কি বল্ মাইরি!

মণিলাল ভদ্রতার সীমায় এসে দাঁড়িয়েচে। নিজের উপর রাগ হ'লো। দূর, মণিলালের সঙ্গ ছাড়াই ভালো। এ পথঘাট ওর জানা, বরং আমারই অজানা! কাজেই ওকে সাহায্য করার কোনো দরকার নেই। অযথা সময়ের অপব্যবহার!

বললাম : মণি, আমি চলি। তোমার তো এ পথঘাট জানা। আমি বরং নোতুন এখানে। তা ছাড়া রাতও হয়েচে। হোটেলে ফিরে যেতে হবে তো ?

না না যেতে নাহি দিব। মণিলাল আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো : মাইরি বলচি ভাই, আয়, আমার কাপ্রেসিনাকে দেখবি আয় ; সে কেমন ভালো মেয়ে দেখে যা ; আমার হাত ধর্ মাইরি, ওপরে চল্।

মণিলালের কাতর মিনতি উপেক্ষা করা গেল না যেন কেন। হয়তো নিজেরো কিছুটা কৌতুহল ছিল। বললাম : আচ্ছা, এসো, কোমর ছাড়ো, হাত ধরো, চলো ওপরে।

কাঠের সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়ে মণিলালের হাত ধরলাম : এসো সাবধানে !

ঠিক আছে। মণিলাল হাম্বড়াই চালে বললো : আরে তুমি চলোনা, আমি ঠিক আছি, হুঁ হুঁ বাব্বা। এই পথে আমার আনাগোনা, কটা সিঁড়ি আছে, তাও গোনা ! বুয়েচো ?

কবিতা হচ্চে দেখচি !

হবেনা। প্রাণে যে ফুর্তির ফোয়ারা ছুটেচে। বুয়েচো চাঁদ।···

এক এক পা করে অতি সাবধানে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ততক্ষণে উপরে উঠেচি। মণিলালের হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম : নাও এবার বরং তোমার চাঁদবদনীর মুখ ছ্যাখো।

হ্যাঁ আমি দেখবো, তোকে দেখাবো—মণিলাল সামনের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো : প্রে, প্রে, দরজা খোল্। খোল্ শীগ্গীর। কং কং—

আচম্কা দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে মধ্যবয়সী এক খাসিয়ানী। হাতে হ্যারিকেনের আলো। সেই আলোতে দেখা গেল তার দেহ ভরা

স্বাস্থ্য, কিন্তু চেপ্টা মুখখানায় অপ্রস্তুতের ভাব। মণিলালের সঙ্গে আমাকে দেখে আরো লজ্জিত। চুল এলো মেলো, কাপড় স্থানচ্যুত, চোখ দুটি নিদ্রালু।

কি ঘুমুচ্ছিলে? মণিলাল জিবেয় বিষ মাখিয়ে বললো: ডেকে ডেকে হদ্দ! চিল্লে চিল্লে হাল্লাক, শালার গলা চিরে চৌচির তবু মাগীদের ঘুম ভাঙে না। কুম্ভকন্নের ঘুম বাবা! না, কি, অন্য পুরুষমানুষ ঢুকিয়েচিস্ ঘরে।

আঃ কী হচ্চে মণিলাল।

ও, তুই! আরে তুই তো আমার বন্ধু। আয়, ঘরে আয়। মেয়েটীকে দেখিয়ে বললো: এ হচ্চে কং। ওর কং, আমারো কং। তোরও কং বুঝলি? আর এ হচ্চে আমার উ-পারা ভাই। বাভা উ-পারা, লক্ষ্মী ভাইটী আমার। বুয়েচিস্ কং?

কং নীরবে মাথা নেড়ে দরজা থেকে স'রে দাঁড়ালো। আমরা ঘরে ঢুকলাম। কং ঘরের মেঝেতে হ্যারিকেনটা রেখে চলে গেল ভিতরের ঘরে। ঘরের এক কোণে একখানা বেতের চেয়ার, পাশে কাঠের টেবিল। তারপাশে একটা পায়ে চালানো সেলায়ের কল। কলের কাছেই একটা বেতের মোড়া। ঘরের আর এক কোণে খাট পাতা। তাতে মোটা গদী। সাদা চাদর বিছানো। পাশাপাশি দুটো বালিশ, চেপ্টানো। লেপটা ছড়ানো। এলোমেলো। বোঝা যায়, দুই বোনে একটু আগেই শুয়েছিলো। ঘুমুচ্ছিলো, তাই হয়তো নীচে থেকে মণিলালের ডাক শুনতে পায়নি।

বেতের চেয়ারখানা দেখিয়ে মণিলাল আমাকে বললো: বোস্ ওখানে। আমি এখানে বসি! কী বল?

জিগ্যেস করলো বটে, কিন্তু আমার উত্তর পাবার আগেই ধপ্ করে নীচু বেতের মোড়াটায় বসে পড়লো। বললো: তুই আমার অতিথি কিনা; তাই ঐ উঁচু চেয়ারে—বুইলি, আর আমি এই নীচু মোড়ায়! ভদ্দতা বুইলি?

খুব বুঝেচি, হেসে বললাম : এ দিকে তুই তোকারি হচ্চে, আর ওদিকে ভদ্রতা দেখানো হচ্চে ! একে কি বলে জানো।

কি ?

একে বলে মোদো-ভদ্রতা !

ঠিক্, ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েচিস্ মাইরি ! বা ভাই বাভা উ-পারা ! মণিলালের যেন কী মনে পড়ে গেল, জোরে হাঁক দিলো : কং ! কং ! আলে হাংনে। এদিকে আয়, মদ নিয়ে আয় শীগ্গীর।

আবার এখন মদ কেন ? আপত্তি করলাম : এইত গিলে এলে।

কং ততক্ষণে গায়ে চাদর জড়িয়ে এঘরে এসে দাঁড়িয়েচে ! আবার বললাম : এই শীতে ওকে পাঠাবে, সেই সে দোকানে !

শীত মানে ? নিষ্ঠুরের মতো মণিলাল বললো : এতক্ষণ লেপের তলায় থেকেও গরম হয়নি বলচিস্ ? আঃ দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? লক্ষ্মী কং আমার, দিদি আমার, বোতলটা নিয়ে বা মাইরি ! রং যে আমার ফিকে হয়ে এলো !

চঞ্চল হয়ে বললাম : তুমি নিষ্ঠুর মণিলাল।

মণিলাল হাসলো শুধু : নিষ্ঠুর আমি ? আমার রং ফিকে হয়ে যাবে—আর ও ফিক্ ফিক্ করে হাসবে তাই দেখে—তুই তাই চাস্ ? তুই মাইরি অতিথি, চুপ করে বসে থাক।—যা দিদি, কা খিন্না বাভা ! লক্ষ্মী মেয়ে ! বলিস্, দাম পরে পাবে, বুইলি ?

ঘাড় নেড়ে কং ঘরের কোন্ থেকে খালি বোতল নিয়ে ভেজানো দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় গেল। দরজা একটু খোলা পেয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘরটাকে হঠাৎ শীত ধরিয়ে দিলো যেন।

উঃ, কী ঠাণ্ডা!—মণিলাল আঁৎকে উঠলো: মাগী দরজাটা খুলে রেখে গেল নাকি?

না বন্ধই আছে!

কং বোধ হয় বারান্দায় জুতো পায়ে দিলো। একটু পরেই কানে এলো খট্ খট্ শব্দ—সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল সে। কং গেল মদ আনতে!

মণিলাল কী যাদু জানে? নিস্তব্ধ রাত্রে, জনহীন পথে এই শীতে একটী মেয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে. বিনা প্রতিবাদে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাতালের খামখেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে তার হুকুম তামিল করতে চলে গেল। কেন? কেন? কি জন্যে? এ তো চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। নির্লজ্জ মণিলাল, নিষ্ঠুর মনিলাল! তুমি কী? কী তোমার শক্তি? টাকা? টাকার জোরে দুটী সরল প্রাণা পাহাড়ীয়া মেয়েকে করতলগত করেচো তুমি? কিন্তু টাকার এমন সৃষ্টিছাড়া শক্তিও তো আগে দেখেচি বলে মনে হয় না। নাকি, এদের স্বভাবই এই! পুরুষের অত্যাচার, অনাচার, হৃদয়হীনতা এরা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েচে? আর, মণিলাল এদের স্বভাব জানে বলেই এত উদ্ধত হ'তে সাহসী হয়েচে সে। নতুবা, এই নিস্তব্ধ রাত্রে, খাস খাসিয়া পাড়ার মধ্যে বিদেশী এক পুরুষ কী সাহসে বিরক্তিকর চীৎকারে, তাদের জাতের মেয়েদের উপর অন্যায় জুলুম করতে সাহস পায়? নোতুন আমি, প্রশ্নের পর প্রশ্নের ধাক্কায় অস্থির হয়ে উঠলাম।

প্রে! কাপ্রেসিনা! মণিলালের রূঢ় চীৎকারে আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল! কাঠের বন্ধ ঘর খানা গম্‌গম্ করে উঠলো

যেন। কই, এদিকে, আলে হাংনে! আমার বন্ধু এসেচে, পান দে, বুইলি, আলাপ ক'রে যা!

পান হয়তো সেজেই রেখেছিল, দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ হাতে এ ঘরে এলো এক যুবতী খাসিয়ানী: প্রে! হ্যারিকেনের নরম আলোয় দেখলাম, প্রের চোখ দুটী লজ্জায় আনত! গাল দুটী লাল, লজ্জায় কি? না, ও লালিমা স্বাভাবিক! কালো কোঁকড়ানো চুলের রাশি সিঁথির দুধারে নেমে গেছে কান পর্যন্ত। মাথায় কালো ওড়না, গলার কাছে গিঁট বাধা।

পানের ডিস্খানা আমার পাশের টেবিলের উপর রাখলো প্রে। ফর্সা নিটোল হাতখানিতে একগাছি চুড়ি, চাঁপার কলির মতো আঙুল গুলির একটীতে শাঁখের আংটী।

প্রে হাতখানা জোড় করে আমাকে নমস্কার জানালো: কুবলাই!

আমি প্রতি নমস্কার জানালাম।

ডিসে পান সাজা দেখে অবাক হতে হলো। পানের খিলি নয়, আস্ত পান চিরে দু'খানা করা, ডিসের গায়ে একটু চূণ আর আধখানা করে কাটা একটা সুপুরি!

নে, পান খা! মণিলাল বললো: দেখে খাবি, বুইলি? রাক্ষসের মতো খাসনে যেন! এই, বলে দেনা প্রে?

বললাম: সুপুরি তো আরো ছোটো করে কাটা দরকার। খয়ের কই?

প্রে হাসলো। ভাঙা বাংলায় মিষ্টি গলায় বললো: ও কুছু লাগবে না। যোতোটা চূণা দরকার, লাগিয়ে নেন পানের গায়ে। পরে মুখে চিবিয়ে নেন আর কামড়ে নেন সুপুরি ওল্লো করে!

সুপুরি কামড়ে খাবো কি? হেসে বললাম: অতো দাঁতের জোর নেই আমার!

দেখেন না খেয়ে, নোরম আছে, কান্‌চা সুপারি ওটা!

মণিলাল এতক্ষণ নেশায় বুঁদ হয়ে মাথা নীচু করে মোড়ায় বসেছিল! তেমনি ভাবেই বললো: খা না বাবা! কেন আর ঢং করচিস্ মাইরি? প্রেকে দেখে বুঝি?

দেখলাম, প্রে লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

আমি বলে বোতল বোতল পান করচি, আর তোর শুধু পানেই এতো অরুচি। তাও আবার প্রের দেওয়া।

আচ্ছা, চুপ করো, আর বাজে বকতে হবেনা। বললাম: নতুন ধরণে পান দেওয়া হয়েচে, দেখে খেতে হবেনা?···বলো প্রে, সুপুরি কি সবটাই খাবো?

না না, প্রে ব্যস্ত হয়ে পড়লো: সবটা খেলে মাথ্‌থা একেবারে ঘুরে যাবে। ওল্পো ওল্পো করে খাবেন। দেখবেন গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকবে; কান দুটো গোরম হ'য়ে যাবে, শীত ভাগবে গা থেকে!

বা বেশ তো!···প্রের নির্দেশ অনুযায়ী পান সেজে নিয়ে খেলাম; দেখি, সত্যিই অত শীতেও গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্চে, কান দুটো গরম হয়ে গেল। বললাম: শীতের দেশে এরকম পান খেলে শরীরটা বেশ গরম রাখা যায় তো?

তাইতো, এইরকম পান এখানে খুব চলিত আছে। প্রে বললো।

ওঃ! খুব যে গপ্‌পো হচ্চে।···অভদ্র মণিলালের জড়ানো কথা শোনা গেল: বলি, খুব জমিয়ে নিয়েচিস্ আমার বন্ধুর সঙ্গে? অ্যাঁ

আঃ কী হচ্ছে ? ধমক দিলাম আমি !

যা বাব্বা ! আমারই ঘরে বসে আমারই ঘরণীর সঙ্গে গপ্‌পো, আবার বলতে গেলে—ধমক !···যা মাইরি, অমন বকিস্‌নি, নেশা ঝরঝর করে পায়ে নেমে যাবে ; আমি মরে যাবো মাইরি ! কেঁদে কেঁদে মরে যাবো !··· মণিলালের গলার স্বর বদলে গেল যেন। ভারি হয়ে গেলঃ মাইরি, কী হবে বেঁচে ? কার জন্যে বাঁচবো ভাই ? তুই বল্‌ ? কেউ নেই মাইরি, জগতে আমার কেউ নেই ! শুধু আমি আছি, আর তুই আচিস্‌ ! কী বল্‌।

মণিলালের কী এক অব্যক্ত বেদনা সহসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, আবার নিজেকে সামলে নিয়ে শুরু করলো মাতলামি। বললোঃ তুই আচিস্‌, আমি আছি, আর আছে প্রে ! কী বল ! কেমন দেখলি ?

কাকে ?

আমার প্রেকে, আবার কাকে ! তুই বড্‌ডো বোকা ! দ্যাখ্‌না চেয়ে ভাল করে ? কুনে কা কাঠাই কা ভা ক্র কুম্‌ কা পুরি ! ··· বুইলি ?

মোটেই না।

তবে দেখলাম, প্রে কথাটা শুনে লজ্জা পেয়ে ও ঘরে চলে গেল। বুঝলাম। অশ্লীল কিছু বলেচে, তাই প্রে ঘর ছেড়ে পালালো। বললামঃ কী যা তা বলচো ?

যা বাব্বা, না বুঝেই গালাগাল ! হাঁ করতেই সাত জুতো !

তবে ও চলে গেল কেন ?

তা আমি কি করবো ? ওর পায়ে ধরে সাধবো ? বল্‌ তাই করি ?

ওর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ !

যা বাব্বা ! বিনে দোষে ?

ঐ যে কী যা তা বললে !

বললাম ঃ ছুঁড়ীটা পরীর মতো সুন্দরী। বলা অন্যায় হয়েচে? বল্ মাইরি, তুই বল্! শেষ কালে তুইও আমার শত্রু হলি? যা শালা, এ জীবন আর রাখবো না। আমার কেউ নেই। কেউ নেই! বলেই হঠাৎ আচমকা নাকি-কান্না থামিয়ে বললো ঃ না, না আছে আছে। এই প্রে. ওয়ালাম খুন কিনথেই।

হাঁক শুনে, প্রে ঘরে এলো, তার বুকে চেপে ধরা এক ঘুমন্ত শিশু। কিছু না বলেই সোজা মণিলালের কাছে গিয়ে তার কোলে শুইয়ে দিলো শিশুকে। বিস্মিত আমি, ও শিশু কার? মণিলালের? হয়তো! মাতাল মণিলাল, শিশুকে দেখেই স্থির হয়ে বসলো, সাগ্রহে টেনে নিলো নিজের কোলের মধ্যে, চেপে ধরলো বুকে। প্রে চলে গেল ও ঘরে।

জানিস্ এ কে? মণিলাল সগর্বে বললো।

কে?

আমার মেয়ে!

তোমার মেয়ে?

হ্যাঁ আমার মেয়ে!

নাম কি?

সতীরাণী!

বাঃ বেশ নাম তো? তোমার বৌ এসব খবর জানে?

জানে মানে? মণিলাল জোর গলায় বললো ঃ সব জানে! সবাই জানে! কাউকে লুকিয়ে কিছু মণিলাল করে না! যা করে, লোকের নাকের ডগায় করে। বুইলি?

সত্যি, তোমার মতো এমন বীরপুরুষ দেখা যায় না। ঠাট্টা করলাম!

মনিলাল ঘাড় বেঁকিয়ে তেমনি জোরেই অথচ টেনে টেনে জবাব দিলো : বীর হয়তো অনেক দেখা যায়, এমন পুরুষ কটা দেখা যায় বল্! গায়ের রক্ত জল ক'রে পয়সা উপায় করি, আবার মদ খেয়ে গায়ের জোলো রক্ত গরম করি। বুইলি? নিজের পয়সায় মদ খাই, মেয়ে মানুষ রাখি, আর তার মেয়েকে আদর করি!

হেসে বললাম : এ তা হলে তার মেয়ে, তোমার মেয়ে নয়!

খবরদার মুখ সামলে! একহাত দিয়ে মেয়েকে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো মণিলাল মোড়া থেকে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে চেপে বসিয়ে দিলাম তাকে। বললাম : ঠাট্টা করছিলাম!

ঠাট্টা! বাঘের সঙ্গে ঠাট্টা!........মণিলাল গজরাতে লাগলো : বিশ্বাস না হয়তো কাছে এসে ছ্যাখ, আমার মতো নাক, কান, চোখ, মুখ কিনা! আগে ছ্যাখ্ তবে বল্ বুইলি? এ আমার মেয়ে; আমার দেহের রক্তের মেয়ে! ও মাগীর সাহস কি যে, অন্য লোককে ঘরে আনে? কেটে কুচিয়ে দেবো না? বুইলি কিছু?

বুঝেচি বৈ কি? মুখে বললাম। কিন্তু মনে মনে বললাম : অদ্ভূত তুমি মণিলাল!

মণিলাল এবার মেয়ের দিকে নজর দিলো। ঘুমন্ত শিশুকে দুহাতে নাচাতে নাচাতে সুরু করলো আদর করা : সোনা আমার, মাণিক আমার, তুই আমার কে রে? পোড়ার মুখো জানে না, তাই বলে তাকে দে রে।

বারে আদর! হেসে বললাম।

মণিলাল আমার কথায় যেন কান দিলো না। মেয়েকে নাচানো চলতে লাগলো, মুখে চললো অদ্ভূত ছড়া! মাঝে মাঝে শিশুটীকে মুখের কাছে তুলে ধরে তার মুখে এঁকে দিতে লাগলো স্নেহের চিহ্ন! মাতাল মণিলাল,

কতটুকু অজ্ঞান, কতটুকু জ্ঞান আছে তার জানিনে, তবে দেখলাম, ভোলেনি সে শিশুটির বাবা, মাতাল হতে পারে, তবু স্নেহে ভরা বাপ !

কিন্তু এক সময় হঠাৎ মণিলালের মতিভ্রম হ'লো। শিশুটীকে ডেকে বললো: হ্যাঁরে খিদে পেয়েচে তোর ? দুধ খাবি ? বলেই বাঁ হাতে শিশুটীকে ধ'রে ডান হাতে নিজের জামা উঁচু ক'রে ধরলো তার বুক পর্যন্ত ! পরে শিশুটীর মুখ চেপে ধরলো নিজের বুকে: খা দুদু খা। চুকু চুকু করে খা !

মণিলালের এই অসঙ্গতি আচরণে আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো: কী অসভ্যতা হচ্চে মণিলাল !

অসভ্যতা ! মণিলাল ঝাঁঝিয়ে উঠলো: আমার মেয়েকে আমি দুধ খাওয়াবো, না তো তুই খাওয়াবি ? ভারী আমার দুধওলা গাইরে !

হঠাৎ প্রে এ ঘরে এসে ছোঁ মেরে মেয়েকে নিয়ে গেল মণিলালের কোল থেকে। মণিলাল হাঁ হাঁ করে উঠলো: এই মাগী আমার মেয়ে দে, দে শীগগীর, খুন কিন মেয়েকে থেই কে।

মণিলাল মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ওঘরে যাবার জন্যে, কিন্তু পা দুটো তার টলে উঠলো বোধ করি। তাড়াতাড়ি হাতের কাছের সেলাইয়ের কলটা ধ'রে সাম্‌লে নিলো নিজেকে। এমন সময় বাইরের দরজায় শব্দ হ'লো, ঠক্ ঠক্।

কে ? কং ?

বাইরে থেকে মেয়েলী গলা শোনা গেল, কী বললো বোঝা গেল না ! মণিলাল ঠিক বুঝেচে, বললো: কং এসেচে !—

বেতের মোড়াটায় আবার বসে পড়ে বললো আমায়: দরজাটা খুলে দেনা ভাই।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। কালো চাদরে গা-মাথা জড়িয়ে কং ঘরে ঢুকলো। আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসলাম।

এনেচিস্ কেয়াদ ? মদ ? মণিলাল অতি আগ্রহে জিগ্যেস করলো।

হাওইদ্! কালো চাদরের তলা থেকে কং বার করলো মদের বোতল!

কা খিন্না ভাবা! কা খিন্না ভাবা! লক্ষ্মী মেয়ে! মণিলাল কংয়ের হাত থেকে কেড়ে নিলো মদের বোতল। ছিপি খুলে বোতল থেকে খানিকটা ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে নিয়ে ছিপি বন্ধ করে প্রের উদ্দেশ্যে বললো: থাকগে, তোর মেয়ে নিয়ে, আমি থাকলাম আসল মাল নিয়ে! কি বল?

মণিলাল আমাকে সাক্ষী মানলো। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল, আর মাতালের সাক্ষী আমি নাকি? মনে মনেই হাসলাম। বললাম: তুমি যে বলেছিলে, পরে মদ চাইলে আর দেয় না। তবে কং আনলো কি করে?

মণিলাল এবার হাস্‌লো। অদ্ভুত হাসি: ঐ তো মজা! আমি গেলে দেবে না, কং গেলে দেবে। —হা-হা! এবার আরও জোরে হাসলো মণিলাল! হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হ'য়ে কংকে বললো: এই কং, আই জা! ভাত দে। বড্ড খিদে পেয়েচে।

কং পাশের ঘরে চলে গেল। মণিলাল আবার মোদো-ভদ্রতা শুরু করলো। মদের বোতল এগিয়ে দিলে আমার দিকে: মাদ্ থিনদিয়েৎ; নে না একটু মদ, খা না!

আমি খাইনে!

খা, না মাইরি একটু! দেখবি তর্‌র্ হ'য়ে যাবি!

তর্‌র্ তোমার কাণ্ড দেখেই হয়েচি!

বটে! সাধুপুরুষ!···খাবি না তো!

না।

তবে ক্ষমা কর্। মাপ ইয়ান্‌গা। আমাকে খেতে দে ভাই অনুমতি!

হেসে বললাম : আমার অনুমতির অপেক্ষা করো ভারি !

এমন সময় প্রে ভাতের থালা নিয়ে এলো এঘরে। সামনে রাখলো মণিলালের। কাঁসার থালায় ভাত, বাটিতে ডাল, একটা কিসের যেন তরকারি। মণিলাল বাঁ হাতে বোতলের গলা ধরে ডান হাতে ভাত মাখতে শুরু করলো ডাল দিয়ে। প্রে সরে দাঁড়ালো দরজার কাছে। মণিলাল এক গ্রাস ভাত তুলে নিয়ে মুখে দিলো বটে, তার বেশীর ভাগটাই ফিরে গিয়ে পড়লো ভাতের থালায় ! মুখখানা বিকৃতি হলো মণিলালের : আরে ছ্যা, ছ্যা, সব পান্‌সে !

বলেই মণিলাল বাঁ হাতের মদের বোতল উপুড় করে দিলো ভাতের থালার উপর। বক্ বক্ শব্দ করে সব মদটা ভাতের থালায় প'ড়ে, দেখা গেল পান্তা ভাতের মতো। মণিলাল তরকারীটাও গুলিয়ে নিলো সেই সঙ্গে। ঐ বীভৎস আয়োজন দেখে গুলিয়ে উঠলো আমার সারা দেহ ! মানুষ মদ না খেয়ে, মদ যখন মানুষকে খায়, তখন তার অবস্থা যে কী শোচনীয় হ'য়ে উঠে মণিলালকে ঐ অবস্থায় না দেখলে অনুমান করা দুঃসাধ্যই ছিলো।

মদ মাখানো ভাত এক গ্রাস মুখে তুলে নিয়ে চিবোতে লাগলো : এইবার ঠিক হয়েচে, বুইলি ? আয়, খাবি আয় ! ভারি চমৎকার খেতে হয়েচে। মাইরি বলচি, ছাখ খেয়ে !

না, আমি খাবো না। জোর গলায় বললাম।

খেতেই হবে তোকে।—হঠাৎ আমার কোঁচা ধরে টানলো বাঁ হাত দিয়ে : খা শীগ্‌গীর, নইলে কাপড় খুলে নেবো।

আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়া গেল তো ! এ দেখচি, পড়েচি যবনের হাতে, এখন খানা খেতে হবে সাথে ! মণিলাল আমার কোঁচা চেপে রয়েচে : তুই খাবি, তবে আমি খাবো।

অগত্যা চেয়ার থেকে নেমে এসে মণিলালের ভাতের থালার সামনে উবু হয়ে বসলাম ঃ এই নাও এসেচি, তুমি খাও!

তুই আগে হাত দে।

আচ্ছা এই যে দিচ্ছি!···অসহায় হয়ে করুণ চোখে চাইলাম প্রের দিকে। দেখলাম, প্রেও বিব্রত বোধ করচে।

কই খা, আমার মতো ক'রে খা। আমার ডান হাত খানা তার বাঁ হাত দিয়ে থালায় চেপে ধরে ডান হাতে আর এক গ্রাস মদ মাখানো ভাত মুখে তুললো। মাথা নীচু ক'রে মণিলাল চিবোচ্চে দেখে, আমি আর এক বার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম প্রের দিকে। প্রে যেন আমার দৃষ্টির অপেক্ষাই করছিলো। হাতের ইশারা করে বুঝিয়ে দিলো ঃ ভাত সমেত হাত মুখের কাছে এনে খাওয়ার ভান করে, হাত নামিয়ে ভাতের গ্রাস ফেলে দাও পাশের ডালের খালি বাটিতে!

আঃ, নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম যেন। প্রে তাড়াতড়ি পাশের ঘর থেকে এক গেলাস জল এনে রাখলো মণিলালের কাছে; সেই সময় চট্‌করে ডালের বাটিটাকে সরিয়ে দিলো আমার কাছে!

এই ছাখো, আমি খাচ্চি।—মণিলালকে দেখিয়ে একগ্রাস ভাত মুখের কাছে আনলাম।

মণিলালের একগাল হাসি। সেই অদ্ভূত হাসি ঃ বা ভাই এই তো চাই। ভায়ের মত ভাই। আমার মায়ের পেটের ভাই। বাভা উপারা।

আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে মণিলাল তার পৈশাচিক খাওয়া খেয়ে চললো আর আমি করতে লাগলাম খাওয়ার অভিনয়।

মণিলাল হঠাৎ হাঁকলো ঃ আই উম্। জল দে! জল!

প্রে এগিয়ে এসে আমার থালার পাশেই রাখা জলের গ্লাস তুলে মণিলালের হাতে দিলো। মণিলাল দু'চার ঢোঁক জল খেয়ে গেলাস মাটিতে রাখতে গিয়ে তার অসংযত হাত থেকে গ্লাস পড়ে গেল মেঝেতে।

আমি সুযোগ বুঝে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম থালার সামনে থেকে; এঁটো হাতেই গিয়ে বসলাম আমার চেয়ারে।

দুশ্, শালার গেলাস! মণিলাল গালাগালি দিয়ে উঠলো। আমাকে বললো: মদের গেলাস হলে পড়তো কখনো হাত থেকে? কখখনো না। বুইলি!

সে তো বটেই! হেসে বললাম: মাতাল মদ খেয়ে মাটিতে পড়ে থাকে দেখেচি, তার হাত থেকে মদের গেলাস পড়তে দেখিনি! হাত থেকে মদের গেলাস পড়ে যাওয়া কি কম লজ্জা মাতালের!

তবে বোঝ্! আমি জোলো-মাতাল নই। মদের মাতাল!

নিশ্চয়ই!

প্রে জলের গ্লাস পড়তে দেখেই পাশের ঘর থেকে ন্যাকড়া নিয়ে এসে এতক্ষণ ঘর মুছছিলো। পরে আমার জন্য এক গ্লাস জল আর একটা গামলা নিয়ে এলো। আমি হাত ধুয়ে ফেললাম।

মণিলাল বললো: এই প্রে, আমারও হাত ধুইয়ে দে। আই উম্। জল আন।

প্রে আরো একগ্লাস জল ও গামলা এনে, মাটিতে গামলা রেখে নিজের হাত দিয়ে মণিলালের হাত ধুইয়ে দিলো। এবার মণিলাল নিজের বাঁ-পা-টা এগিয়ে দিয়ে বললো: আমার পা-টা মুছিয়ে দে!

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখলাম, প্রে ঘরের আলনা থেকে গামছা এনে মুছিয়ে দিল তার পা!

নিজের পা-টা নিজেই মুছে নাও না! বললাম আমি।

বটে! মণিলাল সগর্বে বললো: ওকে আমি রেখেছি কেন? মুখ দেখতে! ওকি আমার বিয়ে করা মাগ, যে, আমার পা মুছিয়ে দেবেনা? ওর ঘাড় দেবে? বুইলি? .....এবার এ পা-টা দে! বলে ডান পা-টা এগিয়ে দিলো প্রেকে: তোরা বিয়ে করতে যাস্, মাকে বলিস্, দাসী আনতে যাচ্চি। আনিস্ কি? দেবী। তার পায়ের তলায় পড়ে লুটিয়ে থাকিস্। ছো-ছো!...দাসী চাস্ তো বিয়ে করিসনে!...বিয়ে করেচিস্?

না?

বা, বা, বেশ করেচিস্। থেকে যা এখানে। একটা ভালো খাসিয়ানী দাসী তোকে জোগাড় করে দেবো। খাপ-সুরৎ! এই প্রে-র মতো!

চকিতে প্রে-র মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম, তার ঠোঁটে মাখা মৃদু হাসি! নিশ্চিন্ত হ'লাম। এ সব মেয়েরা কি দিয়ে তৈরী!

কিরে? পছন্দ হয় প্রে-কে! মণিলাল তাগিদ দিলো।

না!

কেন?

ও তো দাসীর যোগ্য নয়!

বটে! মজেচো। ওকে দেবী ক'রে রাখতে চাও মাথায়? মণিলাল ভেংচি কাটলো: প্রে-কে দেখে মাথাটি ঘুরে গেচে তোর!... এই প্রে, ও ঘরে যা। ওর মাথাটা আর খাস্নে!...বলেই উবু হয়ে বসা প্রে কে পেছনে একটা ঠেলা দিলো মণিলাল।...প্রে টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলো নিজেকে। পরে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

কী অসভ্যতা হচ্ছে মণিলাল? বিরক্ত হয়েই বললাম।

অসভ্যতা? অসভ্যতার কতটুকু তুই দেখলি? দেখবি? কাপড় খুলে তোর সামনে নাচবো?

সভয়ে দেখলাম, মণিলাল সত্যিই মোড়া ছেড়ে উঠচে। কিন্তু আমার সৌভাগ্য মণিলাল উঠতে গিয়ে, মাথায় ঠোক্কর খেলো, পা-চালানো সিঙ্গার মেসিনের টেবিলের কোণায়। পানোন্মত্ত মণিলাল সে ঠোক্কর খেয়ে টাল সামলাতে পারলোনা, ঘুরে পড়ে গেল মেঝেয়! চুপচাপ পড়ে রইল মণিলাল। জ্ঞান হারালো না কি?

তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম তার মাথার কাছে। এ ঘরে ছুটে এলো প্রে, এলো কং।

কী হলো হঠাৎ!—অপ্রস্তুত হয়ে বললাম।

অজ্ঞান হয়ে গেচেন। প্রে বললো।

কং আর প্রে মণিলালের পায়ের দিকটা ধরলো, আমি তার ঘাড়ের নীচেটা কোন রকমে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর, মাতাল মণিলাল সরল শিশুর মতো অসহায়, আলুথালু অবস্থায় শুয়ে রইলো বিছানায়! কস বেয়ে গেঁজলা গড়িয়ে পড়লো বালিশে। নাক দিয়ে বিশ্রী ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ।

গামলায় জল এনে, প্রে মণিলালের চোখে দিয়ে দিলো। জামা কাপড় ঠিক ক'রে দিয়ে পায়ের কাছে জড়োসড়ো লেপটাকে টান করে টেনে দিলো মণিলালের গায়ে, গলা পর্য্যন্ত! স্নেহময়ী নারীর দু'হাতের নীরব সেবা চোখ ভ'রে দেখলাম।

কং পাশের ঘরে চলে গেল!

মণিলালের অনাচারের জন্য আমি যেন নিজেকে অপরাধী মনে করলাম। প্রে-কে বললাম: সত্যিই বড় কষ্ট দেয় দেখচি।

ও কুছু না। হেসে বললো প্রে ঃ কোষ্টো তো আপনার হলো। কুছু খাওয়া হোলনা এখোন পর্যন্তক ! ঘরেভি কুছু নেই যে আপনাকে দিব।

বাধা দিয়ে বললাম ঃ ব্যস্ত হবার কোন দরকার নাই। মিথ্যে বললাম ঃ এখনো খিদে পায়নি।

আজ রাত্রে মণিলাল আমাকে তার বাড়িতে খেতে বলেছিল। সে কথা তার মনে না থাকলেও, বন্ধুত্বের টানেই, সে আমার কোঁচা ধরে টেনে বসিয়েছিল তার সঙ্গে খেতে। খেতে আমি পারিনি, সে দোষ তার নয়, আমার। সে তার কর্ত্তব্য করেচে। তাই বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে অচৈতন্য ! এখন অতিথির পথ অতিথি দেখুক। আর মণিলাল অচৈতন্য বটে, কিন্তু তার প্রতিনিধি পূর্ণজ্ঞানে, ভদ্রতায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

প্রে আমার কথা আমলেই আনলো না ঃ ভুখ্ পায়নি, হতেই পারে না। আপনি বোসেন। আপনি এতো রাত্রে না খেলে মনে বোড়ো কোষ্টো হোবে।

অতিথিকে খাওয়াবার আকুল আগ্রহ ও ব্যগ্রতার কাছে আমার ব্যস্ততা হার মানলো। আমি আমার চেয়ারে গিয়ে বসলাম। প্রে পাশের ঘরে গিয়ে কংকে কী যেন বললো খাসিয়া ভাষায়। দেখি, কং আবার বাইরে যাচ্চে এই শীতে।

একি আবার কেন বাইরে, এই ঠাণ্ডায় ? না, না, দরকার নেই খাবারের। আপত্তি জানালাম।

কং ততক্ষণে দরজা খুলে বাইরে চলে গেচে। প্রে ভেতর থেকে খিল এঁটে বললো ঃ বেশী দূর নোয়, এই পাড়ায় গেলো। একটু পোরেই আসবে।

বিছানায় অচৈতন্য মণিলাল ! পাশের ঘরে ঘুমুচ্চে তার অপকীর্ত্তি ঃ সন্তান সতীরাণী। এ ঘরে আমি, আর যুবতী রূপসী প্রে। অস্বস্তি বোধ

করতে লাগলাম। বাইরে নিস্তব্ধ। নিথর নিঝুম অন্ধকারাচ্ছন্ন! ভিতরে আধ-অন্ধকার আলোর সামনে নিতান্ত অপরিচিতা রহস্যময়ী এক পাহাড়ীয়া নারী—আর আমি তার কাছে তেমনই অপরিচিত ভিনদেশী এক পুরুষ। উভয়েই নির্ব্বাক। আবহাওয়া ভারি। গলা ভারি হয়ে আসে! কথা পথ পায়না, মন দুলে ওঠে।

টাকার বিনিময়ে যে মেয়ে দেহ দান করে, তার দেহ সহজলভ্য বলেই আকর্ষনীয় নয়; কিন্তু যে মেয়ে সেইসঙ্গে মনপ্রাণ সমর্পণ করে, সে পুরুষের কাছে রহস্যময়ী।

প্রে হাল্কা করলো আবহাওয়া। মৃদু হেসে বললো: কী, চুপ হয়ে গেলেন কেনো? আটকালাম বলে?

না, না!—কথা ঘুরিয়ে বললাম: ভাবছিলাম, মণিলালে কথা। ওর জ্ঞান হবে কখন কে জানে! এমন হয়েচে আগে?

প্রায়ই হোয়!

কখন জ্ঞান হয় আবার?

তার ঠিক নেই! প্রায় মাঝ রাত্তিরে!

তখন আবার গোলমাল শুরু করে নাকি?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, প্রের মুখ রাঙা হয়ে উঠলো লজ্জায়। মাথা নীচু করে ছোট জবাব দিলো: হুঁ!

তাড়াতাড়ি অন্য কথায় এলাম: আচ্ছা, কংয়ের নাম কি?

ড্রে। কাড্রেসিনা! প্রে বললো: ওর স্বামী হোরিঙে্ বিন্‌জা, বোড়ো ভাল লোক ছিল। বেচারি গোটো বোছর শিলং সিলেট রাস্তায় লোরী চালাতো। পাইনুরস্‌লার একটু আগে রাস্তাটা ছিল বোড্ড খারাপ আর কা-উমে্ মানে, জোলে হয়েছিলো পিছল। লোরীর ব্রেকটাও বোধহয়

তেমন ভালো ছিলো না। হোরিণ্ডো লোরী সামলাতে পারলো না, মাল শুদ্ধ বহুত নীচেয় পড়ে মোরে গেলো। ড্রে সাতদিন কুছ্ খাইনি শুধু কেনেছিলো। ওরা থাকতো মোথারে একটা বস্তিতে! সে ঘর ছেড়ে দিয়ে ড্রে চলে এলো আমার কাছে।

হোরিণ্ডোর কোনো খবর পাওয়া যায়নি!

হাঁ! প্রে বললো: লোরী কোম্পানী মাল লোরী উঠিয়েছিলো বটে, সেই সঙ্গে হোরিণ্ডোকেও; তোবে তাকে না পেলেই ভালো হোতো!

কেন?

হোরিণ্ডো একতাল মাংস হোয়ে গেলো। প্রের মুখখানি বিষাদে ভরা!

বললাম: সত্যি, সিলেট শিলং রাস্তাটা যেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা—তেমনি কিন্তু ভয়ঙ্কর! যে পথ পেছনে ফেলে আসা হয়, পরে পেছনে ফিরে দেখলে মনে হয়, ও পথে এলাম কি করে! সরু রাস্তার একদিকে উঁচু পাহাড়, আর এক দিকটা নীচে, নীচে, বহু নীচেয় নেমে গেচে। নীচেয় চেয়ে দেখলে মাথা ঘুরে ওঠে।......ও রাস্তাটা দেখা আছে?

না, শিলং ছেড়ে আমি যাইনি কোথাও! হেসে বললো: এখানে জন্মো, এখানেই মোরণ আমার।

বললাম: একবার মণিলালের সঙ্গে ঘুরে এলেই তো হয়? চমৎকার দৃশ্য সব! ডাউকি ব্রিজের কাছটা অদ্ভুত চমৎকার!

হাসলো প্রে। কিছু বললো না। কিছু গোপন করতে চায়। কারণটা দুর্বোধ্য নয়। এমন মেয়ে আছে, পুরুষ যাকে ভোগ করে শুধু, দুর্ভোগ সইতে রাজী নয় তার জন্যে! সে মেয়ে যখন গোপন সঙ্গিনী, তাকে গোপনে রাখাই পছন্দ করে সে পুরুষ।...প্রে এমনিতরোই এক মেয়ে। একে নিয়ে গোপনে সংসার পাতা চলে, প্রকাশ্যে সংসার করা চলে না। পথের

মেয়েকে ঘরে ঢুকিয়ে আবার তাকে ঘরের বাইরে আনতে ভয় পায় বোধ করি স্বার্থপর পুরুষ!

এমন সময় দরজায় শব্দ হ'লো ঠক্ ঠক্।

প্রে দরজা খুলে দিলো। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে কং ঢুকলো ঘরে; হাতে ডিস্-ঢাকা খাবার। টেবিলে রাখলো কং। প্রে এসে খুলে দিলো ঢাকা-ডিস্; মাখন মাখানো রুটী, ছটো কলা, খানিকটা মধু! উপাদেয় খিদের মুখে লোভনীয়!--চমৎকার ব্যবস্থা দেখ'চি! একটু জল। এদেশী ভাষায় কি বলে যেন!

কা-উম্!

হেসে বললাম: কা-উম্!

আমি বলবার আগেই কং এক গেলাস জল এনে আমার টেবিলে রাখলো। হাত ধুয়ে শুরু করলাম খেতে।

প্রে কংকে বললো: ওয়ালাম্ শা।

জিগ্যেস করলাম: তার মানে?

চা আনতে বললাম!

না না চায়ের দরকার নেই। অনেক রাত হয়ে যাচ্চে।

উনানতে জোল তো গোরোম আছেই। শুধু শা ঢেলে দিতে হবে।

তবে হোক্।

আমার খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, চা এলো। চা পানের শেষে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম: মণিলাল এখানে থাকলো, ওর বাড়িতে ভাববে না?

না।

এখানে প্রায় থাকে তা হলে?

প্রে মাথা নীচু করে বললো ঃ হু।

আচ্ছা, চলি তা হলে। অনেক কষ্ট দিলাম।

প্রে হাসলো ঃ আপনি এলেন, বোড়ো আনন্দ হ'লো। আসুন আপনাকে নীচে পৌঁছে দিয়ে আসি। কাঠের সিঁড়িটা ভালো আছে না।

প্রে হ্যারিকেন হাতে দরজা খুললো। একটা দমকা হাওয়া মুখে লেগে গায়ের ভিতরটাও শীতে শিরশিরিয়ে উঠলো। কং ভিতর থেকে দরজা দিল বন্ধ ক'রে। অন্ধকার কাঠের বারান্দার রেলিংয়ের কাছে আমাকে নিয়ে গেল প্রে, গা ঘেঁসে দাঁড়ালো আমার। বাঁ হাত বাড়িয়ে দূরে তারার মতো জ্বলজ্বলে আলোগুলো দেখিয়ে বললো ঃ উই যে সোব আলো, উই হচ্চে বোড়ো বাজার। দেখতে সোজা লাগচে বোটে, কিন্তু আপনাকে যেতে হোবে—ময়লা জোলের পুলের উপর দিয়ে ঘুরে!

দেখলাম, সলমা-চুমকির কাজ করা কালো ভেলভেটের জামা গায়ে শিলং সহর নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন স্পন্দন নেই। তবে মরেনি। দিনের পাইন গাছগুলো রাতের কালো চাদরে গা ঢাকা দিয়েচে বটে, তবে শোনা যাচ্চে এক ঘেয়ে শোঁ শোঁ শব্দ! শীতের শিহরণ হয়তো।

যেতে পারবেন তো পোথ চিনে? প্রে-র স্বরে ব্যাকুলতা!

হেসে বললাম ঃ সেই কলকাতা থেকে পথ চিনে যখন এতটাই আসতে পেরেচি, তখন এটুকু পথ চিনে যেতে পারবো, ভয় করবার কিছু নেই!

প্রে-র যেন হঠাৎ খেয়াল হ'লো ঃ বোড়ো বাজার তো দেখিয়ে দিলাম, আপনি যাবেন কোথা তা তো জানিনে।

যাবো জেল রোডে। ওখানে একটা বাঙ্গালী হোটেলে উঠেচি।

আচ্ছা, তোবে তো ঠিক আছে। প্রে বললো ঃ জেল রোড বোড়োবাজারের কাছেই।

আচ্ছা আসি এখন।

চলুন নীচে নামিয়ে দিই আপনাকে।

প্রে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচেয় নেমে গেল। আমি নামলাম তার পেছনে। নীচের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললাম : আর আসতে হবে না। নমস্কার!

কুবলাই।

হেসে বললাম : হ্যাঁ, হ্যাঁ কুবলাই।

বস্তির সরু নোংরা গলিটা যতক্ষণ না পার হলাম, প্রে হারিকেন হাতে আলো দেখিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথমেই মনে পড়লো গত রাত্রির কথা। মণিলালের আচরণের কথা মনে হতেই মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলো বটে, কিন্তু পরক্ষণেই প্রে ও তার কংয়ের অমায়িক ব্যবহারের কথা মনে পড়তেই মনে হলো কাল এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেচি কিন্তু! স্বার্থ হয়তো, হয়তো কেন, আছেই। মণিলালের অর্থের কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েচে, নত হতে হয়েচে। মণিলালের অন্যায় আচরণ, নিষ্ঠুরতা, তারা মাথা পেতে নিচ্চে তার অবহেলা মাখানো ক'টা টাকার জন্যে! মণিলাল, রূপার জোরে, প্রে-র রূপ-যৌবন শুধু নয়, আশ্রিতা কংয়ের শারীরিক শক্তিটুকুও নিংড়ে নিয়ে ভোগ করচে ষোলো আনা! প্রে-র স্বার্থ, সে সংসার পেয়েচে, সন্তান পেয়েচে, ভালোবাসবার মানুষ পেয়েচে, আর কং পেয়েচে আশ্রয়। বিনিময়ে দিচ্চে সেবা, আন্তরিক সেবা, অসাধারণ সেবা!

সাংসারিক জীবনে মণিলাল কতদূর সংসারী জানিনে, দেনা পাওনার হিসাবে দেখলাম, সে অতিমাত্রায় হিসেবি। কতটা দিলো, আর কতটা পেলো, আরো কতটা পাওয়া যেতে পারে, মণিলাল মনে মনে তার হিসাব ক'ষে পাওনার জের টেনে আনে বোধকরি পরদিনের হিসেবের পাতায়।

মণিলালের কথা যতই মনে হতে লাগলো, ততই যেন তার উপর ঘৃণা বোধ হতে লাগলো। মনে হলো, মণিলালের সঙ্গে দেখা না হলেই যেন ছিল ভালো। অন্ততঃ দেখতে হতোনা বিদেশে একজন বাঙ্গালী কেমন করে সরলা পাহাড়ীয়া নারীর গালে চাঁদির জুতো মেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করচে, করচে বাঙ্গালী জাতির নামে কলঙ্ক আরোপ।...তবে এও ঠিক, মণিলালের সঙ্গে দেখা না হ'লে নারী-চরিত্রের একটা দিক অদেখা থেকে যেতো। বিশেষ করে কলকাতায় থাকতে এই খাসিয়ানী মেয়েদের বিষয়ে কতো কথাই না শুনেচি। রঙালো, রসালো গল্প! তারা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী সহজলভ্যা! সবই হয়তো ঠিক! কিন্তু এসব খবর তো জানা ছিল না। জানা ছিল না, এরা যাকে মন দেয়, তাকে সব দেয় উজাড় করে, তার দোষগুণকে গুণ বলেই মেনে নেয় এমনি এদের গুণ!

বাবু চা! হোটেলের চাকরটা একটা থালায় ক'রে এক কাপ চা নামিয়ে রেখে গেল আমার চৌকির পাশের নড়বড়ে টেবিলটায়।

এতক্ষণ দিব্যি লেপের ভিতর শুয়ে চোখ বুজে গত রাত্রের দৃশ্যটার বিশ্লেষণ করছিলাম, এমন সময় চা আসায় বাধা পেলাম বটে, খুসী হলাম কম না। ঠাণ্ডার জায়গায় গরম চা ঠাণ্ডা করা বোকামি। কাজেই লেপের মায়া কাটিয়েই ছুটলাম বাথরুমে। মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসে গরম চায়ের পেয়ালায় লাগালাম ঠাণ্ডা ঠোঁট!

পরে সকালবেলার দৈহিক দাবীগুলি মিটিয়ে শীত তাড়ানো জামা কাপড়

পরে বা'র হ'লাম গল্‌ফ গ্রাউণ্ডের দিকে। শুনেচি, প্রাচ্যে অত বড় গল্‌ফ গ্রাউণ্ড আর নেই। স্কটল্যাণ্ডের পরেই এর স্থান! শিলংকে সাহেবরা তাই আদর ক'রে বলে : স্কটল্যাণ্ড অব দি ইষ্ট।

জেল রোডটা আস্তে আস্তে নেমে গেচে সরু একটা খালের কাছে— ঝর্ণার শাখা একটা। তার উপরে পুল। পুলের ওপারে পোলো হিলস্‌। পোলো হিলস্‌এর গা বেয়ে যে রাস্তাটা গেচে সেটাই গিয়ে মিশেচে গল্‌ফ গ্রাউণ্ডে। সবুজ ঘাসের যন্ত্র-ছাঁটা মাঠ যেন ভেলভেট বিছানো। দূরে গল্‌ফ ক্লাব। বিলাতী কায়দার বাংলো! লাল টালির ছাদ। গল্‌ফ গ্রাউণ্ডের শেষ প্রান্ত থেকে দুটো রাস্তা গেচে চলে পাইন বনের ভিতরে। একটা শর্ট-রাউণ্ড, একটা লং রাউণ্ড—মোটরে চ'ড়ে অল্প বা বেশী ঘোরবার রাস্তা। গল্‌ফ গ্রাউণ্ডে মেম সাহেবরা ঐ সকালেই সুরু করেচে খেলা। মহাভারতীয় যুগে তুনের মধ্যে থাকতো যেমন তীর—এই বিলাতী খেলায় তেমনি চাকরের পিঠে ব্যাগে থাকে গল্‌ফ ষ্টিক্‌স্‌!

গল্‌ফ বড়লোকি খেলা। সঙ্গে দুটো চাকর, ব্যাগ ভর্তি গল্‌ফ ষ্টিক্‌স্‌, ডজন খানেক বল নিয়ে খেলা—খেলা মানে বলটাকে ষ্টিক্‌ দিয়ে মারতে মারতে গর্তের কাছে এনে সেই গর্তে ফেলা বলটাকে! রাস্তায় ছেলেরা মার্বেলগুলি নিয়ে থ্রি-সিক্স-নাইন খেলে, গর্তে পিলোয় গুলি—তাতে তারা কি ঐ গল্‌ফ খেলোয়াড়দের চেয়ে কম আনন্দ পায়? না। টাকার খেলা বেশি দেখাতে পারলে বেশি মান পাওয়া যায় হয়তো, বেশি আনন্দ পাওয়া যায় না। আনন্দ মনে। মন যদি থাকে মানে ভরা, আনন্দ সেখানে জায়গা পাবে কোথায়?

ঘুরলাম গল্‌ফ গ্রাউণ্ড থেকে। ছোট ঝরণার পুলের কাছে এসে দেখি, খাসিয়া গিন্নীরা সাবান কাচার কাজে লেগে গেচে ঝরণার ধারে ধারে।

কাঁচের মতো চকচকে জলে কাঁপা ছায়ায় প্রতিফলিত হচ্চে খাসিয়ানীদের সাবলীল দেহ আর ধারে ধারে দাঁড়ানো দীঘল দেহী পাইন গাছ! ঐ দুটিই শিলংয়ের বৈশিষ্ট ; দেখবার, মুগ্ধ হবার!

কাজ-না-থাকা ঢিলে সকাল। কলকাতায় ভাবা যায়না এমন হেলা ফেলা দিনের শুরু। ঘড়ির তাগিদে সেখানে ছুটো-ছুটি! তাইতো ক্লান্ত হয়ে ছুটি নেওয়া, পালিয়ে আসা কাজের নাগাল থেকে। এখানে ঘড়ি নেই, দৌড়াদৌড়ি নেই! অঢেল সময় ; মনের মতো খরচ করে যাও, শেষ হবে না। ঘরে বসে আর্শি নিয়ে নিজের মুখখানি দেখো না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে? কাজের ঘানিতে জোড়া থাকলে তো শুধু তেড়ি কাটবার সময় বা দাড়ি কামাবার সময় যা মুখখানি চোখে পড়ে, ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখা যায় না! দেখো না, ডান গালটায় কিসের একটা দাগ হয়েচে, বিশ্রী! দাগটা তোলবার চেষ্টা করো। নাকের চুলগুলো ছাঁটো না একটা ছোট কাঁচি দিয়ে! মাথার চুল আবার একটা দুটো পাকলো নাকি? ও কিছু নয়। ওদিকে মন দিয়ো না, বরং হাতের ন'খগুলো ব'সে ব'সে কাটো, পালিশ করো। দাঁতগুলো লালচে তোমার? সাদা করবার চেষ্টা করো। আসল কথা, নিজে একটু নজর দাও দিকি? টাকার জন্যে টাক গজানো কেন?

শীত-সকালের মিঠে রোদে পিঠ করে ব'সো একটু। দেখো না লোকের চলন-বলন। জীবনের দৈনন্দিন শোভাযাত্রায় আজ যোগ নাই বা দিলে, দেখে যাও। অনেক দেখা হবে! সবটা দেখতে পাবে!

পাইনের পাতার চামর শিলংয়ের হাওয়া করচে এলোমেলো! সেই হাওয়া লাগলো আমার মনে, আমার প্রাণে! তারই দমকা হাওয়ায় খুলে গেল মনের আগল! মনের দরজার চৌকাঠে গালে হাত দিয়ে বসে

তুমিও বলচো ঠিক ? মণিলাল অবাক হলো : কী যে বলো ! যার নোড়া হাতে করেচি, তারই ভাঙবো দাঁতের গোড়া। মদ খাই বলে ? মেয়েমানুষ পুষি বলে ?

নিশ্চয়ই।

ত্মাখো, মদ নিজের পয়সায় খাই, কারও ঘুঁষের বোতল ছুঁইনি কোন দিন।...মণিলালের অহংকার শুরু হোলো : আর মেয়ে মানুষ ? তাকে জোর করে আনিনি, কিনে এনেচি।

কিনে ? অবাক হলাম।

মণিলাল বললো : ওঠো, চলো বেড়াতে। পথে যেতে যেতে সে গল্প বলবো।

মণিলালের ঠেলায় বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো। বললাম : কোথায় যাবে ?

বললো : কোথায় যেতে বাকি আছে বলো। চলো, সেখানেই যাই।

বললাম : বাকি তো অনেক কিছুই আছে। বিডন ফলস্, বিশপ ফলস্, হ্যাপি ভ্যালি, চেরা—কত বলবো ?

বেশ, চলো আজ বিডন ফলসে্। কাছাকাছিই হবে ; আর তোমার লিষ্টিতে তো ঐটাই প্রথম স্থান পেয়েচে দেখচি।

তাই হোক্। শুরু করলাম সাজগোছ। হোটেলেই চা খাবার খেয়ে বেরুলাম দুজনে। ধরলাম শিলং-গৌহাটী রাস্তা। সহরের কোলাহল, ব্যস্ততা থেকে ক্রমেই স'রে যেতে লাগলাম পা পা করে। ফিকে হয়ে এলো জনতা। আঁকা-বাঁকা পথ ধরে আমরা টুকটাক এটা-ওটা গল্প করতে করতে এক সময় এসে পৌছুলাম সহরের প্রান্তে। পথ জনবিরল।

এবার শোনো প্রে-র কথা। মণিলাল বললো : তোমাকে কথা দিয়ে এনেচি, প্রে-র কথা বলবো তোমাকে।

মিথ্যে বলা হবে, যদি বলি, প্রে-র কথা শোনবার ইচ্ছে আমার ছিল না। বরং পথে যেতে যেতে দু' একবার মনেও হয়েছিলো : কৈ? মণিলাল তো প্রের গল্প করচে না! অথচ প্রসঙ্গটা এমনি ব্যক্তিগত আর লজ্জাকর যে, মণিলাল যদি চাপা দিয়ে দিতো ব্যাপারটা, তবে তা রহস্যাবৃতই থেকে যেতো। আমার হাজার ইচ্ছে থাকলেও তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ জানতে চাওয়াটা শুধু অশোভন নয়, অন্যায় হ'তো! কিন্তু মণিলাল, অদ্ভুত মণিলাল লজ্জা যার কাছে লজ্জা পায়—শুরু করলো প্রে-কে কেনার গল্প :

প্রায় বছর চারেক আগেকার কথা, বুঝলে? এসেচি শিলংএ চাকরি নিয়ে। লাবাণে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে সংসার পেতেচি প্রভাকে নিয়ে। বেশ সংসার করছিলাম! দুই ছেলে-মেয়ে, প্রভা আর আমি। খাই দাই, অফিস যাই। ছুটির দিনে ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে এখানে ওখানে বেড়িয়ে আসি, বুঝলে?

হুঁ!

মানে যাকে বলে রীতিমত ডোমেষ্টিক ব্যাপার। দিব্যি ভালো ছেলের মতো সংসার করছিলাম, ক্রমে দু'একটা বন্ধুবান্ধবও জুটলো অফিসের। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর তাদের বাড়ীতে খোস গল্পের আসরও বসতো। সে সব আসরে যে দু' একগ্লাস চলতো না তা নয়; বরং সেই সঙ্গে এখানকার খাসিয়ানীদের গল্পে আরো রঙীন হতো আমাদের সে সব আসর। বুঝলে ব্রাদার, কার ক'টা খাসিয়ানী আছে, কার খাসিয়ানী দেখতে কেমন, কে কেমন করে খাসিয়ানী জোগাড় করেছিল, আবার কার খাসিয়ানীর কথা তার বৌ জানতে পেরেছিলো ইত্যাদি সব মজাদার গল্প! বুঝতেই পারচো, ক্রমে শিলংএর নীচুতলার কথা আমার আর অজানা রইলো না। আর তোমার কাছে তো গোপন আমার নেই কিছু—ঐ সব গল্প শুনে শুনে মনের

ভিতরটাও যেন মাঝে মাঝে রঙীন হয়ে উঠতো। ভাবতাম, বেশ আছে বাপধনরা—গাছেরও খাচ্চে, তলারও কুড়োচ্চে। আটপৌরে ও পোষাকি দুয়েরই ব্যবস্থা করেচে।…তা দু' একজন বন্ধু সাহায্য করতেও চেয়েছিলো, মানে দরদ দেখিয়েছিল। বলতো, এখানে এসে শুধুই ডাল ভাত খাবে পোলাও খাবে না? একটু মুখ বদলে গ্যাখো। বলতো খোদার খাসি তো নও—খাসিয়ানী পরখ করে গ্যাখো একটু।

বললাম: ওঃ, খুব শুভাধ্যায়ী বন্ধু পেয়েছিলে তো! দলে টানতে চেয়েছিল আর কি?

আরে ব্রাদার, এখানে দল ফল নেই। এ দলে প্রায় সবাই! কেউ ডুবে ডুবে, কেউ বা ভেসে ভেসে। যারা এসব দলের সভ্য নয়, তাদের এখানে অসভ্য বলা হয়। হয় তারা কচি খোকা, নয় তারা মেয়েমানুষ!

মানে আমাকে গালাগাল দিচ্চো, তোমাদের পোলাও খাওয়া দলে যোগ দিইনি বলে? হেসে বললাম।

মণিলাল বললো: গালাগাল না দিলেও সেণ্ট পারসেণ্ট পুরুষমানুষ বলিনে তোমায়। অবশ্য, আমিও একদিনে সেণ্ট পারসেণ্ট পুরুষমানুষ হইনি। মানে, প্রভার প্রেমে তখন আমি এমনি অন্ধ এবং অসহায় যে, বন্ধুদের এগিয়ে দেওয়া হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, বেশ আছি বাবা, আমি না হয় একাধারে শ্রোতা আর দর্শকই থেকে যাই, ক্ষতি কি? সবাই যদি সাঁতারে পাল্লা দেবে, কে জিতলো, কে হারলো, হিসেব রাখবে কে?

বাঃ, ভালোকথাই তো বলেছিলে। বললাম: তবে হঠাৎ কেন বদলে গেল মতটা?

সেই কথাই বলি। মণিলাল বললো: প্রভা ক্রমেই আমার কাছে নিস্প্রভ হতে লাগলো।

কারণ ?

কারণ সুস্পষ্ট, আর শ্রুতিকটু হলেও নিষ্করুণ সত্যি। মণিলাল বললো : আমাদের মেয়েরা সহজেই স্বামী পায় বলে স্বামীকে ধ'রে রাখতে জানে না। কিংবা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার মনে করে না। বন্ধুত্ব করা সহজ, বন্ধুত্বকে জিইয়ে রাখা বড় শক্ত। ছ্যাখো বাপু, বিয়ের ঐ যে গোড়ের মালা গাঁথা হয় যে সুতোয়, তা বোধ হয় প্রায় পচা থাকে—তাই বেচারা বৌ বরের ঘর দু'দিন করতে না করতেই বর হয়ে যায় পর।

ঠাট্টা ছাড়ো, কারণ বলো।

বলচি তো। শিলংএ এসে নিজের হাতে সংসার করতে গিয়ে প্রভা ঘোরতর সংসারী হয়ে উঠলো। হেড অফিস হলো তার রান্না-ঘর। হাতা-খুন্তি, চাকি, বেলুন, হাড়ি, কড়া, তাওয়া, তাদের ঠনঠনানি আওয়াজ, আর সেই সঙ্গে প্রভার ছেলেমেয়ে ভড়কানো চীৎকার, সারা বাড়িখানাকে সারাক্ষণ এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখতো যেন। সংসারের কাজে হাত পা যেমন চালাতে লাগলো, তেমনি চালাতে লাগলো মুখ। অফিস যাবার মুখে বড় সাহেবের মুখের ভয় কোনদিন করিনি—কিন্তু অফিস থেকে বাড়ি ফেরবার মুখে প্রভার মুখখানা মনে পড়তেই বুক দুরদুর করে উঠতো। রৌদ্রের হাসি দেখা দূরের কথা, কোনদিন ঘনঘটা মেঘ, কোনদিন ছেলে-মেয়েদের ব'কে ঝ'কে শেষে বর্ষণমুখর ; আর কোনদিন বা দাঁতখিঁচুনীর বিদ্যুত ঝিলিক আর সেই সঙ্গে তর্জন গর্জন।

হঠাৎ কেন এমন হলো ?

হঠাৎ হয়নি। এসব হঠাৎ হয় না। মণিলাল বললো : ঝট্‌পট্‌

গুছিয়ে গাছিয়ে সংসারের কাজ কম্মো সেরে স্বামী আফিস থেকে ফেরবার আগে গা ধুয়ে সেজেগুজে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করা—এলে, হেসে তাঁর সঙ্গে দুটো হাল্কা কথা কওয়া—খুব হাল্কা কাজ নয় হে ব্রাদার। রীতিমত একটা আর্ট—ট্রেণিংয়ের দরকার। প্রভার কেন, অনেক মেয়েরই এ আর্ট জানা নেই। আর জানা নেই বলেই তারা সংসারের ধাক্কায় নাকানি চোবানি খেয়ে ত্রাহি-ত্রাহি চীৎকার করে শুধু, আর পাঁচ-জনের কাছ নিজেকে 'সং' সাজায় মাত্র। ...এসব কথা বলতে যাও কোনো নতুন গৃহিণীকে? বলবে, বাজারের মেয়েমানুষ নাকি আমি যে রূপ দেখিয়ে পুরুষ ভোলাবো? বোঝোনা, পুরুষ, মেয়েমানুষের গুণে মুগ্ধ হয় শুধু, রূপের মোহে থাকে বাঁধা। আবার অনেক রূপসীও বরকে ঘরে রাখতে পারে না কেন জানো?

কেন? তারা 'না' রোগে ভোগে ব লে। মানে, স্বামী যা বলবে, তাতেই বলবে 'না'। এক একটী পাকা বাম-পন্থিনী। দিনে-রেতে কেবল 'না-না' শুনে স্বামীর মনটা যায় বিগড়ে। মনটা হা-হা করতে থাকে। শেষে আটকে যায় কোন বাইরের মেয়ের কাছে, যে তার মনের কথার সঙ্গে দিতে পারে 'হাঁ'। আসল কথা, আমরা শুধু সেবা বা শুধু সাজ চাইনে, চাই combination of two মানে Mixture, বুঝলে?

হুঁ।

আচ্ছা, তুমিই বলো, আপিস থেকে ফিরচো, রাস্তায় কত মেয়ে কত রকম সেজে গুজে বেড়াতে বেরিয়েচে দেখে মনটা একটু আনমনা হয়ে গেচে; হয়তো মনে মনে তাদের কারোর সঙ্গে তোমার স্ত্রীর—ধেৎতেরি, তোমার ওসব বালাই নেই-ই তো বোঝাবো কি—ধরো, আমার স্ত্রীর রূপের তুলনা করতে করতে বাড়ি এসে ডাকলাম, ওগো, কৈ শোনো।

কোথায় তুমি?—অমনি ওগো যদি তখন রান্নাঘর থেকে ঝট্‌কা মেরে বেরিয়ে আসে ময়লা চিরকুটে তেল হলুদ মাখানো শাড়ি প'রে, তেল চুক্‌চুকে মুখে—আবার ঝামটা মেরে বলে: হঠাৎ আবার আদরামো শুরু হলো কেন বুড়ো মিন্‌সের, ভেবেচো, মরেচি নাকি?—তখন, তখন ব্রাদার, বোঝো একবার মনের অবস্থাটা? স্রেফ্‌ মন কুঁকড়ে কেঁচো। সুড়সুড় ক'রে ঘরে ঢুকে জুতো জামা ছাড়তে ছাড়তে হয়তো শোনা গেল হাঁক—কৈ, এসো তাড়াতাড়ি, খেয়ে যাও।—তখন কি মনে হয় জানো?

কি?

খাবারের থালা মাথায় ক'রে উঠোনে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে নাচি আর গাই: মনরে আমার, পেটের খাবার মাথায় আমার, তোমার খাবার তৈরি নেই।

হো হো করে হেসে উঠলাম: এতও জানো তুমি মণিলাল!

জানি ভাই, অনেক কিছুই জানি। জেনে জেনে এখন চুপ মেরে আছি। বোকা ব'নে আছি। আজ তুমি এসেচো, মনের কথা বলে একটু হাল্কা হতে পারচি। প্রাণটা আমার বাঁচচে।

মণিলালের গলার স্বর ভারি। পরক্ষণেই সামলে নিলো নিজেকে। বলতে লাগলো: সংসার যখন বিষবৎ, গৃহ যখন অরণ্যপ্রায়, গৃহিণী যখন ব্যাঘ্রীতুল্যা—অতএব প্রাণ যখন অতিষ্ঠ, ওষ্ঠাগত—এমন সময় প্রভাই একদিন মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, নাও এখন হলো তো? বুড়ো বয়সে লোক হাসানো। জ্বালিয়ে খেলে।

কেন কী হলো। বোকার মতই বললাম।

হবে আবার কী। প্রভা বাধিয়ে বসলো।

মণিলাল বললো : খবরটা শুনে মনে হলো যেন, শাপে বর। ঠিক করলাম বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। না হয় হাত পুড়িয়ে খাবো, মাথা তো ঠাণ্ডা থাকবে। আর, বিরহে মিলনটা যদি বাড়ে ভালোই। তা ছাড়া, এই বিদেশ বিভূঁয়ে কে বাবা আতুড় করবে? লিখে দিলাম শ্বশুরকে, আপনার নাতি হবে। নাতির মুখ দেখতে আপনারা নিশ্চয়ই ইচ্ছুক, তাই লিখচি, ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারেন। অসুবিধে থাকে তো দিয়েও আসতে পারি।

হেসে বললাম : বা চমৎকার প্রস্তাব তো? অগ্রাহ্য করলেন না তোমার শ্বশুর মশায়?

এবার মণিলাল হাসলো : হে আনম্যারেড ব্রাদার, বুঝবে না, বুঝবে না তুমি শ্বশুর কি জিনিষ। দায়ে দৈবে, বিপদে, আপদে অমন একটি পার্থিব সম্পদ আর নেই। তার মেয়েটীকে নিলে, সঙ্গে নিলে টাকার আণ্ডিল, আর কিনলে মেয়ের বাপের মাথাটি। বিলেত যাবে? শাঁসালো শ্বশুর দেখে বিয়ে করো। ব্যবসা করবে? শ্বশুর দেবে টাকা। আবার চাকরি নেই? তার ঘাড়ে বসে খাও। নেশার পয়সা নেই? তার মেয়েকে দিয়ে চাওয়াও। আহা, এমন জিনিষ হয়না, কোথায় লাগে বাবা। বৌয়ের বাবা তার শতগুণে মিষ্টি। এ হেন শ্বশুর ঠাকুরকে যদি নাতির মুখ দেখাতে চাও, তাতে কেতাথ হওয়া ছাড়া তাঁর উপায় আছে কিছু? লাইফ ইনসিওরে প্রিমিয়ামের টাকা গুঁজতে হয়; আর এদেশে বিয়ে মার্কা লাইফ ইনসিওর করলে গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত প্রাপ্তিযোগ। শুধু বিয়ের আগে, বৌয়ের রূপ না দেখে শ্বশুরের রূপেয়ার থলিটা একবার বাজিয়ে দেখে নিতে হবে। বাবা সাধে কি বলি, ঝুলে পড়ো, একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

আর কতদিন ভেসে বেড়াবে? এঘাটে-ওঘাটেও তো জল খেতে রাজী নও, তবে বাঁধাঘাটেই খাও।

সে খাওয়া যাবে'খন, যখন তেষ্টা পাওয়া যাবে। এখন তোমার গল্প চলুক তো।

গল্প নয় ব্রাদার, সব সত্যি কাহিনী। হ্যাঁ, প্রভাকে তো প্যাক ক'রে দিয়ে এলাম তার বাপের বাড়িতে। ফিরে আসবার মুখে, গিন্নী অনেক রকম ইনস্ট্রাকসন্ দিয়ে দিলেন: সময় মত চান করতে, খেতে, অফিস থেকে এসে আর কোথাও না যেতে—ইত্যাদি পাখী পড়া পড়িয়ে দিলেন। আমিও সুবোধ বালকটীর মতো ঘাড় নেড়ে চলে এলাম।...কিন্তু ফিরে এসে দেখি শিলং অন্ধকার, মানে আমার কাছে অন্ধকার।

আহা, হবেই তো। ঠাট্টা করলাম।

হ্যাঁ হে হ্যাঁ। জানো না তো, বৌ কাছ ছাড়া হ'লে কেমন সব ছাড়া-ছাড়া ভাব হ'য়ে যায়। কেমন একটা নেই-নেই ভাব। কী-করি কী-করি মনের অবস্থা। সেটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। ভুক্ত ভোগীরা বুঝবে তখনকার অবস্থা। তুমি বুঝবে না।

বললাম: বুঝেচি, পেয়ে হারাণোর অবস্থা।

অনেকটা তাই। মনিলাল বললো: তা, দিনটা কেটে যেতো নাওয়া-খাওয়া, অফিস যাওয়া নিয়ে। সন্ধ্যেটা বন্ধুমহলে, কখনো বা সিনেমায়। কিন্তু রাত্তিরটায়। বুঝলে? রাত্তিরটায় কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ভাব। শীতের রাত্তির। লেপের মধ্যে পাশ বালিশ জড়িয়ে পড়ে থাকা—বুঝলে, যেন দুধের সাধ ঘোলে মিটানো। সত্যি, বুঝিনে তোমরা জীবনের বেশীর ভাগটা, আর ভালো ভাগটা একলা কাটাও কি করে? বিশেষ

করে বাংলা দেশের সব মেয়েই যখন ফ্রক ছাড়বারঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই মালা হাতে করে রেডি হয়ে থাকে—যাকে-পায়-তাকেই পরাবে ব'লে।

থামো, থামো। ধমকে দিলাম মনিলালকে: বাংলা দেশের মেয়ের কথা শিলংএ এসে তোমার মুখে না শুনলেই চলবে; যা বলছিলে বলো।

বলচি, কিন্তু এবার বাঁয়ে নামতে হবে নীচের দিকে। এসে গেচি বিডন-ফল্‌সের কাছে।

মনিলালের কথামত, তার সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে নামতে লাগলাম নীচের দিকে। মনিলাল আগে, আমি পেছনে। বললাম: হুঁ, তারপর?

তারপর? মনিলাল বললো: বুঝলাম এভাবে একলা কাটানো দুঃসাধ্য; একটা মেয়েমানুষের দরকার, অতএব চাই! কিন্তু চাই বললেই তো হয় না—খুঁজে নিতে হবে। আছে তো অনেক, বাইরে থেকে দেখতেও হয়তো ভালো, কিন্তু ভিতরটা হয়তো পোকায় খাওয়া। যাকে বলে, কুসুমে কীট। দুদিনের সুখ ভোগ করতে গিয়ে দুর্ভোগ কে ভুগবে বাপু? তাই একজন জানা দালাল লাগিয়ে দিলাম। দু' এক টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলে দিলাম: ভালো মাল চাই, পচা, ধ্বসা, দাগী চলবে না কিন্তু। ···দেখো হে, এইখানটা একটু সাবধানে নেমো। পা পিছলে যাবার সম্ভাবনা আছে।

মণিলাল সাবধান করে দিলো। তার দেখাদেখি আমিও সাবধানে নামলাম।

মণিলাল শুরু করলো নিজের থেকেই: দালালটা পাঁচ-সাতটা খাসিয়ানী ছুঁড়িকে দেখালো, বড়বাজারে বাজার করতে এসেছিলো যখন; কিন্তু পছন্দ হলো না। কোনটার নাক খাঁদা, কোনটার গালের

হাড় উঁচু আবার কোনটার চোখ কুতকুতে! দূর দূর! বুঝলে, একটা ছুঁড়িকে দেখালো, যেন হাতির বাচ্চা। শেষে তাড়া মারলাম দালালকে। বলল্যাম ঃ কী যাচ্ছে তাই দেখাচ্চো বাপধন! তোমার ষ্টকে যদি এই কোয়ালিটির মাল থাকে পষ্ট বলে দাও, আর কষ্ট করতে হবেনা। আমি অন্য চেষ্টা করি। বাজে সময় নষ্ট করোনা আমার। লোকটা তখন আমার কাছে দিন তিনেকের সময় চাইলো। রাজি হ'লাম। তারপর একদিন বুঝলে ? একদিন এসে খবর দিলো ঃ বাবু, একঠো বহুত আচ্ছা চীজ মিলা লেকেন কুচ্ জৈদা মাংতা হৈ। বহুত খুব সুরৎ লেড়কী। দো বোহিন, বড়া বোহিনকো সাদি হো গিয়া। ই হ্যায় উস্‌কো বুড্ডি নানীকো পাশ। বহুৎ গরীব, খানে নেহি মিল্‌তা। বলিয়ে তো দেখলায়েগা আজ বড়ি বাজারমে।

বললাম, দেখলাও। তা মাইরি বলবো কি একবার দেখেই মজে গেলাম। যেমন গড়ন, তেমনি চমৎকার দেখতে। কেন, প্রেকে দেখতে ভালো না ?

ভালো

তাহলে স্বীকার করচো তো, শর্মারামের পছন্দ আছে ?

তা আছে !

তার পরদিন গেলাম প্রে-দের বাড়ীতে। খাসিয়া পাড়ার এককোনে ভাঙা ঘর একখানা। ঘরের বেড়া ভাঙা, চালের টিনে জং ধরে ছেঁদা হ'য়ে গেচে। সামনে একটু বারান্দা, চট্ ঝুলিয়ে আড়াল করা। সেখানে রান্না হয়। বসলাম সেই বারান্দার এক কোনে, ভাঙা নড়বড়ে একটা টুলে। বুড়ি নড়তে পারেনা! বাত। ঘরে চৌকিতে মুড়ি সুড়ি মেরে ব'সে আছে। দালালটা ঘরের মধ্যে গিয়ে কি ফিস্ ফিস্

করে বলে এলো। বাইরে এসে বললো: প্রে, আলে হাংনে, ওয়ালাম শা। ইধার আও, চা দেও। প্রে এলো। আহা, যেন ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো। ছেড়া জামা কাপড়, রুক্ষ চুল তবু রূপ যেন ফেটে পড়চে। আমার সামনেই উনুন জ্বালিয়ে কেট্‌লিতে চায়ের জল দিলে বসিয়ে। আমি একমনে দেখতে লাগলাম তার নড়ন চড়ন। চায়ের জল গরম হতে লাগলো, গরম হতে লাগলো আমার রক্ত! . কেট্‌লি দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো আমার ঘন ঘন নিঃশ্বাসও গরম ধোঁয়ারই মতো।

কাব্য থামাও! বললাম।

মণিলাল হেসে উঠলো: লজ্জা পাচ্চো? বেচারা! আচ্ছা সটেই বলি! ...এই এইবার যে বাঁধানো রেলিঙ দেখচো, ধ'রে ধ'রে চলো। শুনচো ঝরণার ফোঁস ফোঁসানি! ওর জলোচ্ছ্বাস মানুষের চক্রান্তে বাধা পেয়েচে, সৃষ্টি হয়েচে বিদ্যুতের। ...যখন প্রে আমার হাতে চায়ের গেলাস এগিয়ে দিতে এলো, তার হাত থেকে চায়ের গেলাস নেবার সময় আমি সুযোগ বুঝে চেপে দিলাম তার গেলাস ধরা হাত। সারা শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল আমার। দেখলাম প্রে-র মুখ লাল। হাত সরিয়ে নিয়ে চলে গেলো ঘরের মধ্যে! ভয় হ'লো, রাগ করলো নাকি মেয়েটা? ইসারা করলাম দালালটাকে, ডাকতে। লোকটা ডাকলো: আলে হাংনে, ওয়ালাম শা। ইধার আও, চা দেও।...প্রে বেরিয়ে এলো। এসে, লোকটাকে চা দিলো যাক, প্রে তাহলে রাগ করেনি। তবু পরখ করে দেখবার জন্যে একটা মতলব ঠিক করলাম। চা'য়ে চিনি ঠিকই দেওয়া ছিলো, তবু বললাম: ওয়ালাম চিনি। খাসিয়া ভাষা তখনও আমার রপ্ত হয়নি ভালো করে। কাজেই 'চিনি'কে কি বলে জানা না থাকায় আমার মুখে অদ্ভুত খিচুড়ি ভাষা 'ওয়ালাম চিনি' শুনে হেসে ফেললো প্রে। আমি হাল্কা হলাম মনে।

চিনি দিতে আসতেই তাকে বললাম : বাবে, দুঃখিত। ···বললো এম এম। না, না। বললাম : কা খিন্না বাভা। লক্ষী মেয়ে। হাসলো প্রে। সঙ্গে এনেছিলাম, রূপোর এক জোড়া রুলি। পকেট থেকে বার ক'রে দেখিয়ে বললাম : খাড়ু! আলে হাংনে। ···কাছে এসে সামনে বসলো, বাড়িয়ে দিলে বাঁ হাতখানা। সযত্নে হাত ধরে পরিয়ে দিলাম তার নরম মোমের মত হাতে রূপোর খাড়ু! ···সেদিনের মতো চলে এলাম। লোকটাকে বলে দিলাম, পাকা করো।

হেসে বললাম : পাকা লোক দেখচি।

মণিলাল হাসলো : দালালটা আবার আমার চাইতেও পাকা। ঠিক বুঝেচে, বাবু ম'জে গেচে। বলে চার'শো টাকা চায় বুড়ি। ব্যাটা লোক চেনেনি। বললাম : নেহি, উলোককো আড়াইশো, আউর তুমকো পচাশ। দেখো, হোগা তো আচ্ছা, নেহিতো ঘুমতি লে আও হামকো খাড়ু— বাহানা। লোকটা ভড়কে গেল। শেষপর্য্যন্ত রফা হলো তিনশো, আর ওর পঞ্চাশ। ···পরে ঘর ভাড়া করে প্রে কে আনিয়ে নিলাম পেমেণ্ট করে। ···তারপরের কথা, মানে আমার আর প্রে-র প্রেম কাহিনী শুনতে চাও, বলতে পারি!

তাড়াতাড়ি বললাম : না।

মণিলাল নির্লজ্জের হাসি হেসে বললো : জানি তুমি পারবেনা সে সব শুনতে! সে কাহিনীতে স্বর্গের প্রেম নেই, আছে কামের পচা পাঁকের দুর্গন্ধ। রসের বদলে তাড়ি! প্রের সঙ্গে আমার পরিচয় পাঁকের কাঁদায়।

কিন্তু আশ্চর্য, বললাম : ও নিজে কলংকে কালো হয়েচে, কিন্তু তোমার হাতে তুলে দিয়েচে তার হৃদয়ের পদ্মফুল!

মণিলাল বললো : সেও এক কাহিনী ফেরার পথে শোনাবো তোমাকে। …ঐ যে দেখচো, ওটাই পাওয়ার হাউস—হাইড্রো ইলেক্ট্রিসিটি ওখানেই তৈরি হয়! পাহাড়িয়া নদী সভ্য জগতের কাছে লাঞ্ছিতা—দাসীবৃত্তি করচে! আমরা এসে পৌছুলাম পাওয়ার হাউসে। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। মস্ত একটা ঘরে সারি সারি ডায়নামো একটানা গর্জন করচে। উঁচু পাহাড় থেকে লম্বা পাইপ নেমে এসেচে পাওয়ার হাউসে। তারই ভিতর দিয়ে পাহাড়িয়া নদীর রুদ্ধ জলোচ্ছ্বাস প্রবল বেগে ডায়নামোর চাকায় ক্রমাগত আছড়ে পড়ে একটানা ঘোরাচ্চে ডায়নামোকে—বিদ্যোৎপাদক যন্ত্রকে। ঐ বিদ্যুৎকে তারের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্চে সারা শিলং সহরে। যান্ত্রিক চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে জলপ্রবাহ পরিণত হচ্চে বিদ্যুৎপ্রবাহে। দেখলাম—শুনলাম—আশ্চর্য হলাম—যন্ত্রের আশ্চর্য ক্ষমতার প্রমাণ পেয়ে। দুঃখও পেলাম সভ্য জগতে যন্ত্রদানবের কাছে প্রকৃতির সন্তানের দাসত্ব দেখে!

মণিলালের সঙ্গে পাওয়ার হাউসের পরিচালকদের জানা শোনা আছে দেখলাম যথেষ্ট। না থাকার কারণ নেই। কার্যসূত্রে এদের সঙ্গে মণিলালের যোগাযোগ রীতিমত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং আমাদের আদর-আপ্যায়ন পরিদর্শনের দিক থেকে কোন অসুবিধাই হ'লো না। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম, মণিলাল এদের কাছে শুধু পরিচিত নয়, রীতিমত শ্রদ্ধেয়! …কিছুক্ষণ থাকার পর আমরা বিদায় নিলাম সেখান থেকে!

শুরু হ'লো পাহাড়ে ওঠা। রেলিং দিয়ে ঘেরা বাঁধানো পথে আমরা উঠতে শুরু করলাম। সূর্যের আলো তখন নরম হয়ে এসেচে। চলেচি, মণিলাল আগে আমি পেছনে—আগের মতই!

নিজের কথা বলার নেশায় মত্ত মণিলালই দিলো পূর্ব কথার ছেঁড়া সুতোয় টান।

বললোঃ আসবার পথে বলেচি প্রে-কে পাবার কথা। এবার শোনাই শোনো, প্রে-র প্রাণের কথা। অদ্ভুত ও মেয়ে! বুঝলে?

হুঁ!

আমি ওকে নিয়ে ডুবেছিলাম পাঁকে। ওর দেহখানাই ছিলো আমার কাছে আগ্রহের আদরের সামগ্রী, ওর মনের কথা কোনদিনই ভাবিনি! ওর দেহের রস নিংড়ে নিতেই ছিলাম ব্যস্ত, ওর প্রাণের রসের ঠিকানা তখনও পাইনি। মদ খেয়ে মাতলামো করেচি, ওর গায়ে বমি করে দিয়েচি, অকথ্য গালাগালি দিয়েচি, ঝোঁকের মাথায় মেরেচিও—কিন্তু অদ্ভুত কোনদিনই ও আমার উপর রাগ করেনি। কেঁদেচে শুধু। নিজের হাতে আমায় চান করিয়ে দিয়েচে, চুল আঁচড়ে দিয়েচে, নানারকম রান্না করে—যা ও পারে—ক'রে খাইয়েচে—পরে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েচে আপিসে। কোনদিন আপিস কামাই করতে দেয়নি, কোনো কর্ত্তব্যে হেলা হ'তে দেয়নি। কী হে, একটা কথা আছে না? মেয়েমানুষ হবে দিনে মায়ের মতো, রাত্রে বেশ্যার মতো! প্রে সেই ক্লাসের মেয়েমানুষ। বুঝলে?

হুঁ!

আমার কাছে বুঝলে, কোনো লুকোচুরি নেই। প্রভার কথা প্রে-কে বলেছিলাম। তখন বলেছিলাম এই ভেবে, একদিন তো জানতে পারবেই। আর কেনা বাঁদিকে নিজের বৌয়ের কথা বলবো তাতে ভয়টা কি? কিন্তু প্রে আমাকে আশ্চর্য করে দিলো কি বললো জানো?

কী ?

বলে, দিদি আনেসে, হাম উনকো পাশ রহেঙ্গে !

বললাম ঃ দুর ছুঁড়ি তা কখনো হয় ? তেলে জলে মেশে কখনো ? তা সে কিছুতেই মানবেনা। বলে, হামকো বাংলা বুলি শিখলাইয়ে। ভাবলাম, যাকগে বাংলা কথা শেখালে তো আর কোনো ক্ষতি নেই। ততদিনে ওর মতলবও ঘুরে যাবে ! ...এদিকে একদিন চিঠি এলো প্রভার ছেলে হয়েচে। প্রে সে খবর শুনে কি খুশি। ওদের কি ছাই পূজো আছে,—তাই করলো একদিন। তারপর থেকে প্রায়ই তাগাদা দিদিকে রূপেয়া পাঠাও।

অদ্ভূত তো ? বললাম।

আরো আছে। মণিলাল সগর্বে বললো যেন ঃ ছেলে হবার দুমাস পরে প্রভা চিঠির উপর চিঠি দিতে লাগলো, আমাকে নিয়ে যাও ! চাকরি নিয়ে গোলমাল হচ্চে, বাড়ী পাচ্চিনে মনের মতো ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে দুমাস কাটিয়ে দিলাম !

তুমি একটি পাষণ্ড ! ঠাট্টা নয়, আমার কণ্ঠে ছিলো ঘৃণার আভাষ !

নির্লজ্জ মণিলাল সে কথা গায়েই মাখলো না। বরং হেসে বললো ঃ যা ইচ্ছে বলো। তখন প্রেয়সী প্রে-র প্রেমে হাবুডুবু খাচ্চি ! তাড়ি খেয়ে তখন তর্-বুর্ ! প্রভার চিঠি পাবার পর মনে হতো, ঘোড়ার ডিম এত লোকের বৌ মরে ছেলে হ'তে গিয়ে—আর আমার বেলায়।—চুপ করো। ধমকে উঠলাম ঃ তোমার আর কিছু বলতে হবে না। তুমি একটা পাপিষ্ঠ, পাষাণ, নিষ্ঠুর—কী বলবো জানিনে !

মণিলালের মুখে তেমনি হাসি ঃ আমি নিজেই জানিনে, আমি কি— আর তুমি দুদিনেই তা বলে দেবে ? গণৎকার নাকি ?

না বাপু আমি কিছু নই। এখন চলো মুখ বুজে !

তা হয় কখনো ! মণিলাল কপট গাম্ভীর্য দেখালো : গল্পের শেষ না করলে পেট ফোলে। যে বলে তারও ফোলে, যে শোনে তারও। গল্প আমাকে বলতেই হবে, শুনতেও হবে তোমাকে !

বেশ, তবে তাড়াতাড়ি শেষ করো।

তাই করবো। মণিলাল শুরু করলো : বুঝলে শেষপর্যন্ত প্রভা যখন লিখলো, তুমি না নিয়ে গেলে আমি নিজেই কউকে ধরে চলে আসবো তখন লিখতেই হলো, তাই চলে এসো, আমি ছুটি পাচ্চিনে ! তবু তো কদিন প্রের কাছে থাকা যাবে !

শেষে একদিন প্রভা এলো বাপের বাড়ীর দেশের কার যেন স্কন্ধে ভর ক'রে। আরে, পরের পয়সায় শিলং দেখে যাবে লোকের অভাব কি ! বাড়ী ঠিক করাই ছিলো, ঐ বাড়ী যেখানে গেছলে। উঠলাম সেখানে ! এদিকে প্রে আব্দার শুরু করলো, দিদির কাছে থাকবো।...আমি যত বোঝাই সে পোড়ারমুখী কি বোঝে ?...শেষে একটা মতলব ঠিক করলাম—প্রভাকে বললাম, বাচ্চাকে নিয়ে তোমার কষ্ট হচ্চে, একটা ঝি রাখি। প্রভা প্রথমে খরচের ভয়ে আপত্তি করেছিলো, পরে বোঝালে বুঝলো, রাজী হলো।... এইবার দেখে ওঠো, এটা সর্টকাট্। যেটা দিয়ে এসেছিলাম, ওটা দিয়ে গেলে দেরি হয়ে যাবে। অন্ধকার হয়ে যাবে। একটু গেলেই উপরে পাকা রাস্তা !

কি, শিলং গৌহাটী রোড ?

হ্যাঁ।

বেশ তবে তাই চলো।

মণিলাল ডাইনের সর্ট-কাট পথ ধরলো। আমি তারই পদাংক অনুসরণ করতে লাগলাম।

আমি প্রে-কে জিগ্যেস করেছিলাম—মণিলাল বললেঃ তুই কেন আমার বাড়ীতে যেতে চাস ? চোখ নামিয়ে বলেছিলো প্রেঃ সে হামি বলতে পারবে না।

বললামঃ না বলতেই হবে। বললোঃ তোমাকে না দেখে হামি থাকতে পারবেনা !···শোনো গপ্‌পো !

বললামঃ জানাজানি হয়ে যাবে। বললোঃ হামি তোমাকে সব সময় দেখবে শুধু। তোমার সঙ্গে কথা বলবে না। ভাবলামঃ মন্দ কি ? আমিও তো দেখতে পাবো। আর বেচারি এত ভালবাসে আমায় দেখা যাক, ওর কথা মতো কাজ করে। বললাম, কাল আমি আপিস থেকে বাড়ী ফেরার পর যাস্ আমাদের বাড়ী। বলবি, আমার বৌকে, লোক রাখবেন খবর পেয়ে এসেচি ; পারবি তো ? বললো হাঁ পারবে !··· বুঝলে, এতদিন ওর নরম লোভনীয় দেহখানা নিয়েই মত্ত ছিলাম; সেদিন পেলাম ওর প্রাণের ঠিকানা। মীরাবাঈয়ের একটা গান আছে না—ম্যায় নোকর রাখো জী ! তেমনি ব্যাপার ! আমাকে দেখতে পাবে ব'লে— আমার বাড়ীতে ও ঝি গিরি করতেও রাজি। বুঝলে !

হুঁ !

প্রে-কে সুখেই রেখেছিলাম। জামা কাপড়, গয়না-পত্তর কত দিয়েচি, নিজের থেকেই ও চায়নি কোনদিন। ওর মতো মেয়ের পক্ষে বিলাসিতার চরম আস্বদ পেয়েও, তা ছেড়ে দেওয়া কত যে শক্ত কাজ তা সেদিন আমি বুঝলাম। পেলাম ওর প্রাণের ঠিকানা।

তবু ভালো !

ভালো যা, তা দেখবার মতো চোখ আমার আছে হে আছে ! একেবারে নির্বোধ, বেরসিক আমায় ভেবো না।···যাক পরদিন বিকেল

বেলায়, আমি আপিস থেকে এসে মুখ হাত ধুয়ে বারান্দায় বসে চা খাচ্চি, এমন সময় উঠোনের দরজায় এসে দাঁড়ালো প্রে ! চেঁচিয়ে বললাম, ওয়াং হাজান, ইধার আও। কেয়া মাংতা ? প্রে বললো : নোক্‌রি। ততক্ষণে প্রভা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েচে। আমি বললাম : চাকরি চায়। রাখবে নাকি ওকে ! প্রভা এক নজরে দেখে নিলো ওকে। বললো : না, কেন ? কিছু বললো না প্রভা। আবার জিগ্যেস করলাম তাকে—কেন ? রাখবে না ঝি ? প্রভা হাসলো। বললো : ঝি রাখতে পারি, কিন্তু খাল কেটে কুমীর আনতে পারিনে। নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে কোন বোকা !...জোরে হেসে উঠলাম : হায় হায়, একটা ঝিকে তোমার ভয়। আমার প্রেম কি এতই ঠুনকো ?

মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো : সাংঘাতিক তুমি মণিলাল !

মণিলাল বললো : সাংঘাতিক কিনা জানিনে, আত্মরক্ষার সময় ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই। শাস্ত্রে এই মতই বলে বুঝলে ?

আর বুঝে দরকার নেই।

আমি প্রভাকে বোঝালাম, তুমি ভয় করোনা। আমি আর কতক্ষণ বাড়ীতে ? আর তার সঙ্গে আমার দরকারই বা কি ? তোমারই তো ফরমাস্ খাটবে, থাকবে তোমার চোখের সামনেই। আর এখানে এই রকমই ঝি পাওয়া যায়। খারাপ দেখতে আর কোথায় পাবো বলো ? আর খারাপ মতলবই যদি থাকতো আমার তুমি যে এতদিন ছিলে না—কোনো একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম না বুঝি ? ..প্রভা কী ভাবলো যেন, বললো রাখো। তবে কথা-টথা বোঝাবো কি করে ? বুঝবে তো ?...প্রে সব শুনছিল আমাদের কথা—বললে : হামি কুছু কুছু বাংলা কোথা জানি। বহুৎ বাঙালী বাবুর বাড়ীমে কাম কিয়া।...মাইনে ঠিক হয়ে কাজে বাহাল হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম প্রে-কে ঃ কি কিরতেং উসি ? নাম কিয়া। বললে, কাপ্রেসিনা। প্রে।···

আচ্ছা এবার তুমিই বলো, যাকে তুমি আদর করেচো, সোহাগ করেচো, ভোগ করেচো সে যদি তোমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় আর এমন দেখায়, যেন তোমাকে চেনে না—তখন তোমার মেজাজটা কেমন হয় বলো দেখি ? বিগড়ে যায় না ?

সরি মণিলাল, তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। জানা নেই।

বেশ জেনে রাখো, রীতিমত বিগড়ে যায় মেজাজ।

মণিলাল বললো ঃ প্রথমে বুঝতে পারিনি। ভাবলাম, প্রে-কে দেখতে পেলেই মনটা শান্ত থাকবে ! কার্যক্ষেত্রে দেখি ঠিক তার উল্টো। বুঝলে ? দেখি আর মনটা হুহু করে ক'রে ওঠে। কথায় আছে না, out of sight, out of mind ও ঃ খাঁটী কথা ! সুযোগ সুবিধে বুঝে, প্রে-কে দু দিন হাত ধরে টেনেছিলাম—কিন্তু ছুঁড়িটা এমন পাজি, ঝাটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে চলে গেল। কাঁটায় কাঁটায় কথা রাখতে চায়। কিন্তু আমার অবস্থা, দিন-দিন ধরি ওরূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। বরং প্রতিদিন প্রতি অঙ্গ লাগি ওর, প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর এমনি সঙ্গীন অবস্থা ! ক্রমে মনে হতে লাগলো, প্রের প্রেম কমে আসচে বোধ হয় ! নইলে ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেবে কেন ? আমার ধারণা সত্যি কিনা দেখতে হবে, বোঝাপড়া করতে হবে, বুঝলে ? সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম, একদিন মিলেও গেলো। সেদিন কি জন্যে যেন অপিস থেকে একটু আগে আগেই বাড়ী ফিরেছিলাম। প্রভা তখন বাথরুমে। ছেলেমেয়ে দুটো হয়তো কোথাও গেচে—বাড়ীতে দেখি কেউ নেই।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখি—প্রে বিছানা পাতচে একমনে। পাশে দেখলাম ছোট বাচ্চাটা ঘুমুচ্চে। আমি একবার কেউ আসচে কিনা দেখে নিয়েই পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম : প্রে, ডো ইয়াংগা, প্রে একটা চুমু দে !...হঠাৎ ঐ অবস্থায় পড়ে চমকে উঠলো প্রে।

বললো : প্লেমরেন—নির্লজ্জ ! প্রাণপণে নিজেকে আমার হাত থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। তা' পারে কখনো। কিন্তু হঠাৎ দেখি প্রে দরজার দিকে চেয়ে পুতুলের মতো নিশ্চল হ'য়ে গেল। দরজার দিকে আমারো চোখ যেতে দেখি, প্রভা দাঁড়িয়ে ! সায়া-ব্লাউজের উপর শাড়িখানা আলগা ক'রে জড়ানো—বাথরুম থেকে কাপড় কেচে ঘরে আসছিল বোধ হয়।...বুঝতেই পারচো আমার অবস্থা ! হাত দুখানা সিসের মত ভারি হয়ে ঝুলে গেলো। প্রে সরে গিয়ে দেয়ালের কোণের দিকে মুখ করে নিজের আঁচল চাপা দিয়ে মুখ নীচু ক'রে কাঁদতে লাগলো। আর আমি কি করলাম বলতো ?

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো : দাঁত বার করে হাসতে লাগলে।

না, না, ব্রাদার, অতটা নির্লজ্জ নই আমি। চোখের ঢাকনা দুটো আছে, তুমি দেখনি ?...আমি খাটের উপর বসে মাথা নীচু ক'রে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলাম। প্রভা বোধহয় ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিলো শুধু বললো, চমৎকার ! পরে আমার সামনে এগিয়ে এসে বললো, এইটাই আমি আশা করেছিলাম। বুড়ো হতে চললে, লজ্জা করে না ? আর কেন, ওকে নিয়ে ঘর করো—আমাকে বিদেয় করো। মলেই বাঁচতাম !...আমি মাথা নীচু করে সব শুনতে লাগলাম ; বুঝলাম, প্রভার গলার স্বর ভারি হয়ে এসেচে ; হয়তো তার চোখে জল ছিলো, কিন্তু মাথা উঁচু করে চেয়ে দেখবার সাহস ছিল না। তবে পরক্ষণেই মাথা উঁচু ক'রে দেখতে হলো

প্রভার কাণ্ড! এই মাগি, হারামজাদি—বলেই বিছানা ঝাঁট দেবার ঝাঁটা কাছেই ছিল তাই নিয়ে শপা-শপ্ প্রে-র আগাপাছতলা ঝেঁটিয়ে দিলো। জানোনা তো, মেয়েমানুষ সব দিতে পারে, স্বামীকে দিতে পারে না কাউকে। বললো, কীরে মাগি, ঐ বিছানায় শোবার সখ হয়েচে বুঝি? বলেই আবার শপা-শপ্! প্রে অদ্ভুত। আমি করলাম দোষ, আর আমার সামনে সে মেঝেয় বসে পড়ে ঘাড় গুঁজে মার খেতে লাগলো। আমি দেখতে লাগলাম, কিসসু বললাম না। ভাবলাম, মারুক, মনের ঝালটা মিটবে তা হলে প্রভার। প্রে-কে উত্তমমধ্যম পিটিয়ে শেষে প্রভা বিদেয় করলো তাকে, ওঠ্ মাগি, বেরো বাড়ী থেকে, চলে যা আমার চোখের সামনে থেকে হারামজাদি। মাইনে পত্তর কিসস্থ দেব না। ওঃ কুজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার ইচ্ছে!···খুব জবর কথা বলেছিল প্রভা! শুনে হাসি পেয়েছিল খুব—কিন্তু ব্যাপারটা আরো জটিল হ'য়ে যাবে ভেবে মুখখানাকে কাঁদো-কাঁদো করেই রেখেছিলাম মনে আছে!···এই, এইবার পাকা রাস্তায় পড়া গেচে শিলং গৌহাটী রোড!...কেমন লাগচে গল্প? জোলো না ঘন?

বললাম: তার চাইতেও যদি কিছু থাকে তাই।

কিন্তু তারপরের ব্যাপার, এই পাকা রাস্তার মতোই পালিশ করা। আর এই পীচ কালোর কালচে, কলংকে কালো।

মানে?

মানে, প্রে চলে গেল। গেল তার দিদিমার বাড়ীতে। মাইনে পত্তর পেলো না বটে, কিন্তু মাইনে দেবার মালিকই যখন তার পায়ে বাঁধা—পায়ে তার সোনার নুপুর বাজবে, আশ্চর্য নয়। ঐ বাড়ী যেখানে গেছলে, ভাড়া করে প্রে-কে এনে তুললাম সেখানে, পোষাকী সংসার পাতলাম তাকে নিয়ে। বাসন কোসন, খাট বিছানা, সবই কিনতে

হলো আমার ছুনম্বরের সংসারের জন্যে। গত বছর ওর জন্মদিনে ঐ সিঙ্গার মেসিনটা কিনে দিয়েচি!

হুঁ! সেটার টেবিলের কোনে ধাক্কা খেয়ে গত রাত্রে পপাত ধরণীতলে হয়েছিলে।

তাই নাকি? মণিলাল হাসলো: ঐ ঘটনার পর প্রভা ক'দিন বিগড়ে ছিল। দুতিন দিন খায় নি। দরজায় খিল দিয়ে পড়ে থাকতো ভাঁড়ার ঘরে। হয়তো বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে উঠতো, দুটো চা'ল সিদ্ধ করে দিতো ছেলে-মেয়ে দুটোর জন্যে। আমি নিয়মিত হোটেলে খেয়ে আপিস যেতাম, সন্ধ্যে বেলায় হোটেলে খেয়ে ঢুকতাম বাড়ীতে। রাত্রের শাস্তি বরাদ্দ ছিল, একলা শোয়া। তারপর প্রে-র একটা ব্যবস্থা করার পর মাঝে মাঝে ডুব দিতাম। প্রভা বোধ হয় দেখলে ব্যাপারটা অন্যরকম ঘুরে যেতে পারে, কাজেই ক্রমে সে স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগলো। আর না হয়েই বা উপায় কি? চোরের উপর রাগ করে হয়তো মাটিতে ভাত খাওয়া চলে—না খাওয়া চলতে পারেনা! তাছাড়া কোন কিছু নিয়ে বেশী টানা হেঁচড়া করলে তা ছিঁড়ে যাবারই সম্ভাবনা। বুদ্ধিমতী প্রভার তা জানা ছিলো হয়তো! কিন্তু প্রায় রাত্রে অ্যাবসেণ্ট হতে দেখে প্রভার মেয়েলি মন ও চোখের কাছে আর কিছু অজানা রইলনা। প্রে-র প্রেমে যে বাঁধা পড়ে গেছি—ক্রমে সেকথা জানতে পারলেও, আর হাতের কাছে ঝাঁটা থাকলেও, প্রে-কে হাতের কাছে পেলোনা সে। আর আমার উপর ঝাড়বে? আরে আমি যে তার পতি অর্থাৎ পরমগুরু।

গরু? শুধরে দিলাম।

আরো শুধরে দিলো মণিলাল: লিঙ্গজ্ঞানের অভাব দেখচি তোমার! বিয়ে না করে ভালই করেচো! ...হ্যাঁ যা বলছিলাম, প্রভা যখন

দেখলো তার স্বামীর খানিকটা খাবলে খেয়েচে অন্যে, তখন বুদ্ধি করে বাকীটুকু ফেলে দিলেনা আস্তাকুঁড়ে। হয়তো জানতো, বেকায়দায় পড়লে, অৰ্দ্ধং ত্যাজতি পণ্ডিতঃ। আর এ প্রবাদ কার না জানা আছে, নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো।

কিন্তু আমার মনে হয়, কানা মামার চাইতে নাই মামা ঢের ভালো। কানা খোঁড়ার শতেক গুণ! আর অঙ্গের যে জায়গায় পচন ধরেচে ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে তা কেটে ফেলাই ভালো।

ঠিক বলেচো, মণিলাল বললো: ঐখানেই ভুল করলো প্রভা। অঙ্গহানির ভয়ে প্রভা আমার দেহমনের পচন তেমনিই থাকতে দিলো দগদগে হ'য়ে। ও রোগের ওষুধ নেই, ও রোগ সারাবার ডাক্তারের খবরই বা জানে কে? কিন্তু ও রোগ যে ছোঁয়াচে—থাকগে, ওসব ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে ঘাটাঘাটি আর না করাই ভালো। তোমায় শেষকালে ধরবে। শুকনো হেসে বললো মণিলাল: এখন বলো কাল কোথায় যাবে বেড়াতে? হ্যাপি ভ্যালি? আমি উত্তর দেবার আগেই, মণিলাল রাস্তায় এক ভদ্রলোককে দেখেই বলে উঠলো:

এই যে পরেশ বাবু!

আপনি এখানে? পরেশ বাবু জিগ্যেস করলেন!

আমাকে দেখিয়ে মণিলাল বললো: আমার বন্ধু ইনি। এসেচেন কলকাতা থেকে। এঁকে নিয়ে গেছলাম বিডন ফলসে! তারপর আপনার কারখানা তো পরশু ইনস্‌পেকসন করে এসেচি। আপনি ছিলেন না। বলে এসেচি, কয়েকটা বেল্টিংএ সেফ্‌টি গার্ড দিয়ে আড়াল করে দিতে। ওয়ার্কার্সদের এ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। তখন আপনিই মুস্কিলে পড়বেন। খবর পেয়েচেন তো?

হাঁ! পরেশ বাবু হন্তদন্ত হ'য়ে বললেন, আমি দু একদিনের মধ্যে আপনার ইন্সট্রাকসন্ মত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। পরে কাচু মাচু হ'য়ে বললেন ভদ্রলোক : দেখবেন যেন রিপোর্টটা—

মণিলাল হেসে বললো : ঠিক আছে। ইন্সট্রাকসন্ ক্যারি আউট করুন দিন সাতেকের মধ্যে। ভয় নেই কিছু। চলি।

আমরা শিলং সহরের সীমানায় এসে পৌছুলাম। দেখি, বিডন ফলসের জলো-বিদ্যুতের আলো শিলংএর কালো আকাশে তারার মতো জ্বল জ্বল করচে।

উঃ, বকে বকে গলা শুকিয়ে গেচে। মণিলাল গম্ভীর গলায় বললো।

বললাম : চলো, কাছাকাছি কোন রেষ্টুরেণ্টে চা খেয়েনি।

আরে দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে!

বুঝতে পারলাম ওর চালাকি। বললাম : তুমি যাও, দুধু খাওগে। আমরা ঘোল খাওয়া ছেলে, আমাদের ঘোলই ভালো। আমি আমার পথ দেখি, হোটেলে যাই।

মণিলাল আমার হাত ধরলো : কেন মিছে গোল করচো ব্রাদার। মণিলালের স্বরে অন্তরঙ্গতার সুর : চলোনা যাই ভূতের কেত্তনে? আমি একলাই যাবো? এক যাত্রায় পৃথক ফল?

হঠাৎ একটা মতলব এলো মাথায়। বললাম : বেশ যাবো আমি এক সর্তে!

বাৎলাও!

ভূতের কেত্তন থেকে তোমায় সোজা যেতে হবে তোমার নিজের বাড়ীতে।

মণিলাল হাসলো : প্রে-র বাড়ী কি আমার বাড়ী নয়! সে বাড়ীর ভাড়া দেয় কে? আমি।

অত বুঝিনে, কড়া হুকুম দিলাম : তোমার স্ত্রীর কাছেই থাকতে হবে রাত্রে।

তুমি বলচো? হুকুম?

হ্যাঁ, তাই।

বেশ তাই হবে। চলো, চল্‌রে নওজোয়ান।

বললাম : তার আগে একবার আমার হোটেলে চলতে হবে যে! রাত্রের mealটার কথা বলে দিতে হবে!

মণিলাল বললো : ছাখো, ভূতের কেত্তনের পর, তখন আমিই বা কে, আর তুমিই বা কে—কিছুই খেয়াল থাকেনা; কাজেই আগের থেকেই বলে রাখচি, মানে, স্বস্থ মস্তিকে, অন্যের বিনা অনুরোধে এবং সর্বান্তঃকরণে যে, হোটেলের পাততাড়ি গুটিয়ে আমার ডেরায় আস্তানা গাড়তে হবে তোমায়।

হেসে বললাম : কোন ডেরায়? এক নম্বরে না দু-নম্বরে?

মণিলাল খুব খুশি। মনের মতো কথা হয়েচে তার। পিঠ চাপড়ে বললো : যেখানে খুশি! আমার হৃদয় দুয়ার খোলা বন্ধু, আমার সকল দুয়ার খোলা! বলো? কোন্ নম্বরে যাবে?

আপত্তি জানালাম : বেশ তো আছি, কেন আর তোমাদের জ্বালাতন করা?

জ্বালাতন? মণিলাল গম্ভীর হয়ে গেলো : লোকের বাড়ীতে লোক

যাওয়া বা থাকা জ্বালাতন? তুমি তাই মনে করো? বেশ আমি জ্বালাতন হ'তেই চাই! তুমি যাবে কিনা বলো।

মণিলাল নাছোড়বান্দা। স্বীকার করতেই হলো: আচ্ছা যাবো, তবে আজ আর নয়, কাল!

কত নম্বরে? মণিলাল মুচকে হাসলো।

কাল বলবো!

মণিলালকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে গিয়ে রাত্রের meal রাখতে ব'লে তার সঙ্গে গেলাম তার ভূতের কেত্তনের আসরে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে সেখান থেকে বেরুবার মুখে দরজার সামনেই পেলাম বাধা। মণিলালের মনে তখন রং ধরতে শুরু হয়েচে সবে। এমন সময় সদর দরজার সামনে দেখা গেলো রঙীন প্রজাপতির মতই এক খাসিয়ানী। ভরা যৌবন, রূপে ঝলোমলো, রসে টলোমলো। প্রজাপতির মতো রঙ বেরঙ সাজত, পায়ে ছিল উঁচু জুতো!

কুবলাই! মণিলাল এ্যাটেনসান্ হয়ে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম দিলো!

খাসিয়ানী হেসে শুধু বললো: কুবলাই।

কা রোজ, বুড ইয়াংগা। এসো না? মণিলাল বললো।

এম্! মেয়েটী উত্তর দিলো।

তা যাবে কেন? মণিলাল ঠাট্টা করলো: এখানে লোক আসবার কথা আছে?

খ্লেমরেন।

বটে, আমি নির্লজ্জ। মণিলাল ভেংচালো: তুমি লজ্জাবতী লতিকা? সাহেবকে ফাঁকি দিয়ে হোটেলে এসেচো ফুর্তি করতে? ওরে আমার

লজ্জাবতিরে! বলেই মেয়েটির থুৎনী ধরে আদর করতে গেল মণিলাল। এক ঝটকায় মণিলালের হতে ঠেলে দিয়ে, মেয়েটি বিরক্ত হ'য়ে ঢুকে গেল হোটেলের মধ্যে। শুনতে পেলাম, বললো শুধু : বোম্বায়েদ।

আমি বললাম : কী বললে ও?

আমি নাকি মাতাল হয়েচি! মণিলাল ফিকে হাসলো : হয়েচি নাকি?

কেন ওসব মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে যাও? বিরক্ত হয়েই বললাম : নিজের মান নিজের কাছে।

তুমি বলতে চাও, ওসব মেয়ে সতী সাবিত্রী? মণিলাল ঠাট্টা করলো আমাকে : ওরে আমার ধনরে! শালুক চিনেচে গোপাল ঠাকুর! উনি কে জানো? ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পোষাকী মেয়েমানুষ। দেখলেনা সাজন-গোজন, চলন বলন? মিলিটারি-মিলিটারি ভাব।

তা এখানে কি?

ঐ তো চাঁদ বদন! চাঁদ বদনী এমনি আসেনি এখানে। চলো, যেতে যেতে বলচি!

মণিলাল পথ ধরলো। আমি চললাম তার পাশে পাশে।

বুয়েচো, চাঁদ-বদনীর সাহেব বোধ হয় টুরে গেচে—তাই বেরিয়েচেন মুখ বদলাতে! আবার সতীপনা!

বললাম : তা' ওর যা ইচ্ছে করুক না। তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?

তোমার জন্যে ব্রাদার, তোমার জন্যে।

আমার জন্যে? আশ্চর্যই হলাম।

একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে। মণিলাল মুচকে হেসে

বললো : ভাবলাম, শিলংএ এলে, নিরমিষই থাকবে? মদ তো খাবেনা, মেয়েমানুষে আপত্তি কি?

বটে এত দরদ? হেসে বললাম : ছাখো মেয়েমানুষে আমার বড় ভয়, ছেলেমানুষ কিনা?

লাও, লাও, ওসব বাজে বুজরুকি রাখো—মণিলালের কথা জড়িয়ে যেতে শুরু হয়েচে : এমন জায়গায় নিয়ে যাবো, ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না, বুয়েচো হে ব্রাদার?

বুঝেচি তো! কিন্তু আমার কি ইচ্ছে জানো?

কী? বলে ফ্যালো!

আমার ইচ্ছে তোমার এক নম্বর বাড়ীতে যাওয়া! ভাবলাম, বাড়ী-পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে হোটেলে ফিরে যাবো।

তুই বলিস কিরে মুখপোড়া? মণিলাল চোখ বড় বড় করে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল : তুই আমার বাড়ীতে যাবি ফুর্তি করতে? বা বাব্বা!

ফুর্তি করতে কেন, কাঁদতে।

কিসের দুঃখে? আমি মরেচি?

চলো বলচি—ঠেলে মণিলালকে চালালাম। হেসে বললাম : মরোনি, তবে মরচো না বলেই কাঁদবো!

বুঝলো ঠাট্টা। বললো : পাবি, গলা ধরে কাঁদবার লোক পাবি সেখানে।

কাকে?

আমার এক নম্বরকে!

আবার কৌতুহল : কেন, তুমি বেঁচে আছ, তাই তিনি কাঁদেন বুঝি?

চুপ চুপ পাজি! মাতাল ভেবে ঘরের খবর নিতে চাও? বলেই কথা ঘুরিয়ে দিলো : এই শোন, এক কাজ করা যাক!

কি!

আজ বরং দু নম্বরেই যাওয়া যাক! কী বল?

খবরদার। কথা দিয়েচো মনে নেই?

নিশ্চয়ই। মণিলাল মাথা নাড়িয়ে বললো : মরদকা বাত্ হাতিকা দাত্!

তবে চালাও পা এক নম্বরের দিকে!

ঠিক হ্যায়।

মণিলাল জোরে পা চালাতে লাগলো। কিন্তু ট'লে পড়ে যাবার মতো হতেই ধরে ফেললাম তাকে : বুড়ো বয়সে হাড় গোড় ভাঙবে?

বুড়ো? কে বুড়ো? নিজেকে দেখিয়ে মণিলাল বললো : এ বাবা জনি ওয়াকার, ষ্টিল গোয়িং ষ্ট্রং! বুইলি? কিছুদূর গিয়ে যেন মনে হলো পথটা মণিলালের বাড়ী যাবার পথ নয়; অন্য পথ ধরেচে সে। আমারও গোলমাল হয়ে গেচে পথ।

বললাম : মণিলাল, এ তো বাপু তোমার বাড়ী যাবার পথ নয়?

নিশ্চয়ই এই পথ,—মণিলাল পথে পা ঠুকে জানালো : বাড়ীর রাস্তা আমি জানিনে, তুই জানিস? আমার বাড়ীতে, আমার বেশি যাতায়াত না তোর?

তোমারই হওয়া উচিত, কিন্তু মাসের আদ্ধেক দিন তো বাড়ীর পথ মাড়াওনা!

সেটা আমার খুশি! বুইলি!

যাক! আজ কিন্তু তোমার এক নম্বর বাড়ীতে যেতে হবে। কাল রাত্রে খেতে বললে, অথচ বাড়ীতেই গেলেনা!

মণিলাল অবাক হলোঃ বারে, আচ্ছা বেইমান আচিস্ তো তুই! প্রে-র বাড়ীতে তোকে সঙ্গে নিয়ে খেলাম, আর তুই বলচিস, খাইনি! যা বাব্বা!

আরে দূর, তোমার বৌয়ের হাতের দেশী রান্না খাবো, তা না পাহাড়ী রান্না খাওয়াতে চাও! ওসব খাওয়া যায় নাকি?

ও, কাল প্রে-র বাড়ীতে খেয়েচো, আজ প্র-র বাড়ীতে খেতে চাও। বেশ তাই হবে—বেপরোয়া মণিলাল বললোঃ দেশী রান্নাই খাওয়াবো'খন!

তবে ঠিক পথে নিয়ে চলো।

ঠিকই তো যাচ্চি, বেঠিক যাচ্চি নাকি? বেঠিক শ্রীমান মণিলাল মুখুজ্জে যায়না। বুইলি?

যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। শ্রীমান আত্মগরিমায় গরম হ'য়ে ঠিক পথেই যাবে আশা করি বাড়ীর দিকে! নিজেও আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। জানি মণিলালের বাড়ীতে বলা নেই, কওয়া নেই; মণিলালের স্ত্রী কোন ব্যবস্থাই করেনি আমার খাওয়ার জন্যে। তা হোক, মণিলালের কাছে যেতে চাওয়া তো তাকে বাড়ী নিয়ে যাবার একটা ফন্দি মাত্র। আর কৌশলে মণিলালকে যদি বাড়ী নিয়ে যেতে পারি রাত্রে, অন্ততঃ একটি নারীর ম্লানমুখে হাসির রেখা দেখা যাবে, সেটা কি কম পাওয়া? বাইরে-রস-সন্ধানী স্বামীকে ঘরে এনে দিয়ে, তার স্ত্রীর নীরব অভিনন্দন ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লাভ করা, লোভের বৈকি? মন সেই শুভক্ষণের জন্যে উন্মুখ হয়ে রইলো।

মণিলাল আমার ঘাড়ে ভর দিয়েও টলতে টলতে সত্যিই এসে

দাঁড়ালো তার বাড়ীর সামনে। সদর দরজা বন্ধ। ডান পা উঁচিয়ে ধাক্কা মারলো দরজায়। ডাকলো : প্র, আমি এসেচি। আমি না আমরা এসেচি। খুলবে দরজা ?

প্র অর্থাৎ প্রভা দরজা খুলে দিলো। আমাকে দেখে মাথায় কাপড়টা তুলে দিয়ে স'রে গেল দরজার একপাশে।

হেসে বললাম : দেখুন, কাকে এনেচি।

দেখেচি বৈকি ! মণিলালের স্ত্রীর গলার স্বর রুক্ষ : এখন ভেতরে আসুন, দরজা বন্ধ করি।

মণিলালকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলাম। মাথাটা বুকের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে মণিলাল বললো : আমার বিছানা কোথায় প্রিয়ে প্র ?

ও পাশের ঘরে। প্রভা উত্তর দিলো।

আয়। বলে মণিলাল আমার ঘাড়ে ভর দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলো। মেঝেয় ঢালা বিছানায় ছেলে মেয়েরা ঘুমুচ্চে, বসলো মণিলাল গিয়ে পাতলা করে বিছানা পাতা চৌকিতে, তলায় ইঁট দিয়ে উঁচু করা। আমিও বসলাম পাশে।

মণিলালের স্ত্রীর ব্যবহারে মনটা দমে গেচে। স্বামী বাইরে পড়ে থাকলে স্ত্রীর মুখে হাসি থাকেনা, আর পাঁচ জনের কাছে মুখ থাকেনা দেখেচি। স্বামীকে স্ববশে আনতে না পারার অক্ষমতা মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো পরাজয়, জানি। কিন্তু একজন যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, কোন হত-ভাগিনীর নীরব দুঃখের সমব্যথী হয়, তার মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্যে তার উশৃঙ্খল স্বামীকে জোর করে ধরে আনে বাড়িতে—হ'তে পারে তা একদিনের জন্যে মাত্র, তবুও তার ঐ সামান্য উপকারটুকু, ভাল করবার আগ্রহটুকু—এতই কি অবজ্ঞার যোগ্য ? অভ্যর্থনা না করতে পারো,

অবহেলাই বা কেন? হতভাগিনীর মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে এই হতভাগার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

নিজের উপরেই রাগ হতে লাগলো। যেচে উপকার করতে যেমন যাওয়া! কেন আর কি কাজ নেই? আর এখনই বা হাঁ করে বসে আছ কেন? নেমন্তন্ন খাবে?

মনের ধমক খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম: আচ্ছা ভাই মণি, উঠি এবার।

মণিলাল এতক্ষণ থুৎনিটা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে, মাথা নীচু করে ঝিমুচ্ছিলো। আমার কথা শুনে মাথা তুলে চোখ চেয়ে হাঁ হয়ে রইলো শুধু।

আমি চললাম। আবার বললাম তাকে।

মণিলালের চোখ ছলছল করে উঠলো: আমায় ছেড়ে চলে যাবি? তবে কেন, কেন আনলি এখানে? তবে চল, আমিও যাই সঙ্গে।...... প্র-র উপর রাগ করেছিস্, না।

মুখে হাসি এনে বললাম: দূর। মনে মনে বললাম: ওরে মাতাল, তোমার স্ত্রীর অবজ্ঞাটুকু তোমার দৃষ্টি থেকেও এড়ায়নি তাহলে?

মণিলাল বললো: তুই বোস্, বোস্ মাইরি, আমার মাথা খাস্। গেরস্তের বাড়ীতে এলি—না খেয়ে যাসনে, অকল্যাণ হবে। আর তোর তো আজ নেমন্তন্ন রে। তোর রাইট্ আছে বোসবার, খাবার। ডাকনা তোর বৌদিকে।

তুমি বরং ডাকো গে।

তবে থাক্ বোস্ একটু। বুইলি? এখুনি আসবে'খন।

মণিলালের কথায়, এত দুঃখেও হাসি পেলো। নিজের বাড়ীতেই মণিলাল সংকোচে কুণ্ঠিত, আর আমি তো তার অতিথি। দুটি শক্ত সমর্থ

পুরুষ, একজন দেহে দুর্বলা নারীর ভয়ে কুঁকড়ে বসে আছি ঘরের মধ্যে। টুঁ শব্দটুকু করবারও সাহস হারিয়ে বসে আছি। নারীকে কী দিয়ে তৈরী করেচো, হে ভগবান। পুরুষকে জব্দ করতেই কি নারীর সৃষ্টি? তুমিও তো ভগবান, পুরুষ!

ভগবান বাঁচালেন কিনা জানিনে, তবে প্রভা নিজেই ঘরে ঢোকায়, তাকে ডাকার দায় থেকে বাঁচলাম আমরা দুজনেই।

মণিলাল সসংকোচে বললো আমাকে দেখিয়ে: এর আজ এখানে নেমন্তন্ন।

ও আচ্ছা আসচি। বলেই প্রভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লজ্জিত হলাম মনে মনে। বাড়ীতে কোন ব্যবস্থা না করেই বাড়ীর কর্তা অতিথিকে আমন্ত্রণ করে আনা মানে বাড়ীর কর্ত্রীকে অপ্রস্তুতে ফেলা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বাধা দেবার, আপত্তি জানাবার আগেই কর্ত্রী অদৃশ্য হয়েচেন, হয়তো লজ্জায়।

বললাম মণিলালকে: কেন মিছিমিছি ওঁকে লজ্জায় ফেললে? খাওয়াবে তো ব্যবস্থা করেচো কিছু? খবর দিয়েচো আগে? জানেন উনি?

আমার এতগুলি প্রশ্নের ঠিকঠিক জবাব দেবার ক্ষমতা ছিল না জানি মণিলালের। কিন্তু প্রভা ঢুকলো জবাব হাতে ক'রে! ডান হাতে তার একখানা থালা। তাতে কয়েকখানা রুটি, পাশে একটু তরকারি, একটা ছোট বাটিতে বোধ হয় ডাল বাঁহাতে জলের গেলাস।

আমার পাশের টুলখানায় থালা আর গেলাস নামিয়ে রেখে বললো: খান।

আমি থ' ব'নে গেলাম যেন। মণিলালের ঢুলঢুলে চোখ বিস্ময়ে যথাসম্ভব গোল হয়ে গেল।

এ কী খাবার আনলে ? মণিলাল বললো।

কেন এইতো বেশ। হেসে বললাম : ডাল রুটিই তো ভালো।

ভালো ! ঘোড়ার ডিম ভালো। মণিলাল দাঁত খিচিয়ে উঠলো : বাড়ীতে ডাল-রুটি খেতে পাসনে বুঝি !

সে তো তুমিই জানো ভালো। প্রভা মুখ খুললো : নইলে জানো না— রান্না হয় না রাত্রে ? এখানে আসার ঠিক ছিল তোমার ? বলেছিলে লোক খাবে ? যা ঘরে ছিল তাই দিয়েচি।

বেশ করেচেন। হাত বাড়িয়ে এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে ডালের বাটিতে ভিজিয়েচি এমন সময় মণিলাল 'বেশ করাচ্চি আমি' বলেই বাঁ পা দিয়ে ঠেলে দিলো টুলটাকে। টুল গেলো উল্টে। থালাসুদ্ধ রুটি পড়লো মাটিতে আর ডালসুদ্ধ ডালের বাটিটা ছিটকে লাগলো মাটিতে-শোয়া মণিলালের ছোট ছেলের কপালে। ছোটো ছেলেটা আঁৎকে কেঁদে উঠলো।

প্রভা তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে নিয়ে বাইরে গেল।

কেটে যায়নি তো ?

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। মণিলাল উত্তর দিলো : যাকগে কেটে। চল্, আমরাও কেটে পড়ি। মিছিমিছি ধরে নিয়ে এলি। তোরও খাওয়া নষ্ট, আমারও মজা নষ্ট। বুইলি ? চল্ তোকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো—চপ্ কাট্‌লেট অমলেট্ যা চাইবি।

খুব হয়েচে। আর গিয়ে দরকার নেই। তুমি শোও, আমি হোটেলে যাই। উঠে দাঁড়ালাম।

বটে। তুই যাবি, আর আমি থাকবো ?...যেখানে তোর অপমান, সেখানে আমি থাকবো ? বটে ! চালাকি !

বাইরে বারান্দায় ছেলেটা তখনও কাঁদচে অল্প অল্প। কোথায়, কী ভাবে লাগলো, কে জানে।

বললাম : ব'সো, দেখে আসি ছেলেটার কি হলো ?

বটে ! তাই বলে ওধার দিয়ে কেটে পড়ো আর কি ?

না, না, আমি যাব না। কথা দিচ্চি। একবার দেখা দরকার তো, ছেলেটার কী হলো ?

আখোগে যাও, মণিলাল মাথাটা যথাসম্ভব নীচু করে বললো : দরদ দেখচি উথলে উঠলো। মা'র চেয়ে মাসির দরদ। যা বাব্বা। অন্য কোন মতলব নেই তো ?

মণিলালের অভদ্র ইঙ্গিত বুঝলেও, না-শোনার ভানই করতে হলো; করতে হলো কর্তব্যের খাতিরে ! ঘরের বাইরে এলাম। দেখি, আধ-অন্ধকার বারান্দার এক কোণে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আঁচলে মুখ গুজে ব'সে আছে প্রভা। কাঁদচে নাকি ! ছেলেটি তখনও মৃদু কান্নার জের টেনে চলেচে।

দ্বিধা জড়ানো পায়ে পা-পা করে এগিয়ে গেলাম তার দিকে।

বেশী লেগেচে নাকি ?

কোনো উত্তর নেই।

কোথাও কেটে যায়নি তো ?

তবু সাড়া নেই।

আপনার কী হলো ?

এবার ফোঁস করে মাথা তুললো প্রভা : কী না হলো, তাই বলুন। অপমানের একশেষ হতে হলো, ছেলেটার মাথা ফুলে ঢোল হলো। আর কী হলে খুশি হ'তেন বলুন ?

আমি খুশি হ'তাম ! অবাক আমি।

থমথমে মুখতুলে প্রভা বললোঃ সারাদিন তো হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, শত্রুগুলোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি ; রাত্রে যে একটু চোখের পাতা এক করবো তাতেও আপনার বাদ সাধবার কি দরকার ছিলো বলতে পারেন ?

এইবার নিজেকে ঠিক করে নিলাম, শক্ত ক'রে নিলাম। কঠিন গলায় বললামঃ স্বামী বাড়ী এলে স্ত্রীর গাত্রদাহ হয়, জানা ছিল না, আজ জানলাম।

তাহলে নতুন কিছু জানলেন বলুন ?

মনে তো হয় ! এমন অদ্ভুত অভ্যর্থনা পাবো আশা করিনি !

আশাহত হয়েচেন দেখচি ! প্রভার মুখে বিদ্রূপের হাসি।

তা বৈ কি ? উত্তর দিলামঃ মাতাল স্বামীকে রাত্রিতে ধরে আনলে তার স্ত্রীর কাছে অন্ততঃ মৌখিক কৃতজ্ঞতাটুকু আশা করা অন্যায় নয়।

প্রভা এবার অস্বাভাবিক হাসি হাসলোঃ মৌখিক কৃতজ্ঞতাটুকু পেলেই খুশি হতেন ? বাঃ এমন দিলখুশ লোক তো দেখা যায় না।

এমন সময় ঘর থেকে শোনা গেল মণিলালের জড়ানো চীৎকারঃ কী বাবা, ছেলে দেখা হ'লো না এখনও ? না এখন ছেলের মাকে দেখচো ব্রাদার ? ছাখো, দেখে যাও। আমি তো দেখে দেখে হদ্দ হয়েচি। এবার তুমি দেখো। ঘুঘু দেখেচো, ফাঁদ দেখোনি তো— এবার ছাখো !

প্রভা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললোঃ শুনচেন কথা ? মধুবর্ষণ ?

শুনেচি।

এর পরেও কি মৌখিক কৃতজ্ঞতাটুকু আশা করেন ?

ওর মুখের কথা কি ধরবার মতো? বুঝিয়ে বললাম: ও নিজেই জানেনা, ও কি বলচে!

কে বললে আপনাকে? বিদ্রূপে প্রভার ঠোঁট দুখানি বাঁকানো: আপনি না জানতে পারেন আপনার বন্ধু কি বলচেন, কিংবা না-জানার ভান করতে পারেন, কিন্তু আমি জানি মর্মে মর্মে ওঁর কথার মর্ম, আর আপনার বন্ধুও জানেন—তিনি কি বলতে চান! মদ খেয়ে মাতাল হ'ন উনি—বেহুঁস হন না। অনেক দিনের অভ্যাস তো?

কী বলতে চান আপনি? রূঢ় প্রশ্ন আমার।

তেমনি স্পষ্ট জবাব: বলতে চাই, ওকে আপনি আনলেন কেন? আপনার কি দরকার ছিল? আপনার এই করুণায় আমি কৃতজ্ঞ হবো এমন ধারণা কেন হলো জানতে পারি কি? আপনি এখানে বেড়াতে এসেচেন—ঘুরুন, বেড়ান, চলে যান নিজের জায়গায়। বন্ধুর স্ত্রীর মলিন মুখে হাসি ফোটাবার এত চেষ্টা কেন? একদিন বা এক রাতের জন্যে নোঙর-ছেঁড়া নৌকো ঘাটে বেঁধে বাহবা নিতে চান? বাহবা অত সস্তা নয়!

বাহবা, বাহবা! ঠিক, ঠিক বলেচো! ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েচে মণিলাল: ঠিক বলেচো প্রভা! অত সস্তা নয়! বুইলে ব্রাদার, প্রভা অত সস্তা নয়! একি বাওয়া, বাজারের মেয়েমানুষ পেয়েচো যে টাকা দেখিয়েই টানবে হাত ধরে?

মণিলাল! কঠিন স্বরে ধমক দিলাম।

কিন্তু মণিলালের মুখে নির্লজ্জের বাঁকা হাসি!

আমি দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়ালাম: আর না। যথেষ্ট হয়েচে। এবার চলি!

অমনি রাগ! নির্লজ্জ মণিলাল কবিতা আওড়ালো: অমনি

চলি গো, চলি গো, যাইগে চলে ? কোথায় যাবে চাঁদ ?

বললাম ঃ নরকে !

প্রভা মুখ বেঁকিয়ে বললো ঃ তা হলে আর কষ্ট করে যাচ্ছেন কোথায় ? সেই স্থানেই তো অবস্থান করচেন !

ঠিক বলেচো। বা ভাই। মরে যাই, মরে যাই ! মণিলাল দুহাত তুলে নাচতে গিয়ে টাল খেয়ে কাঠের মেঝের উপর বসে পড়লো। কাঠের দেওয়াল আর টিনের চালের বাংলোখানা কেঁপে উঠলো যেন ! মনিলাল পা ছড়িয়ে বসে রইলো মেঝেতে।

বললাম ঃ মণিলাল ওঠো ! ঘরে যাও, শোওগে !

শোবো ? মণিলাল ধপ করে তার দেহের উপরের ভাগটা মেঝের উপর শুইয়ে দিলো। একেবারে চিৎপাত !

এ সব কী হচ্চে ! রাগ ক'রেই বললাম।

যা হবার, তাই হচ্চে ! উত্তর দিলো প্রভা।

মণিলালের কাছে গিয়ে তার ডান হাতখানা ধরে টানলাম, কিন্তু সে ওঠবার নামও করলো না। যেন অচৈতন্য হয়ে গেচে ! হয়তো সত্যিই !

প্রভাকেই বললাম ঃ আসুন দেখি ধরাধরি করে ঘরে শোয়াতে পারি কি না।

বয়ে গেচে আমার। স্রেফ জবাব দিলো প্রভা ঃ এনেচেন ঘরে শোয়াতে, আপনি শোয়ান, আমি পারব না !

বাইরে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হবে যে ! বললাম।

সে দায় আপনার, আমার নয়। কাটা কাটা কথা বলতে লাগলো প্রভা ! অদ্ভুত অভদ্র স্ত্রীলোক তো ! বিরক্ত বোধ করলাম, নিজের উপর রাগ ধরে গেলো। ভাবলাম, বেশ, আমারই যখন দায়, তখন

আমাকেই যাহোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মণিলালের ডান হাতখানা ধরে হেঁচড়ে টানবার চেষ্টা করলাম। মাথাটা তার ঘুরে গেল খানিকটা ডানদিকে। মনে হলো পাথরের মতো ভারি, অনড়! রেগে ডাকলাম ঃ মণিলাল! মণি!

প্রভা চুপ করে বসে দেখছিলো। আমার হাঁক শুনে ঠাট্টা করলো ঃ আহা বন্ধুর উপর চট্‌চেন কেন? একটু আদর করে ডাকুন। বলুন, সোনামণি! ওঠো।

আপনি চুপ করুন। ঝাঁঝিয়েই বললাম।

চুপ করেই তো ছিলাম বাড়ীতে। এলেন কেন বাড়ী বয়ে মাতাল নিয়ে—

প্রভার কথা শেষ না হতেই মণিলাল তড়াক করে উঠে বসলো ঃ এই, কে বলচিস্ আমাকে মাতাল! আমি মাতাল? যে বলে সে মাতাল! তার বাবা মাতাল, তার চো-দ্-দ পুরুষ মাতাল! আমি শালা মাতাল! আর তোমরা দুজন ফাঁকতাল? তাল খুঁজচো? খোঁজো!

সুযোগ বুঝে তাড়াতাড়ি মণিলালের হাত ধরে উপরের দিকে টানলাম ঃ ওঠো, চলো ঘরে যাই।

তাই চলো! মণিলাল বলামাত্র পেছনে দাঁড়িয়ে তার দু বগলের তলায় হাত দিয়ে তাকে টেনে তুললাম ঃ হাঁ, ঘুসিয়ে দে ঘরের মধ্যে!

কোন কথা না বলে মণিলালের কোমরে বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার ডান হাতটা আমার ডান কাঁধের উপর ফেলে আমার ডান হাত দিয়ে ধ'রে ঘরের ভিতর নিয়ে এলাম। মেঝেয় বিছানায় বড় দুটি ছেলেমেয়ে ঘুমে অচেতন। না জাগলে বাঁচি। বাপের মাতলামো হয়তো দেখেনি তারা, হয়তো বা দেখেচে। কে জানে! অতি সন্তর্পনে মণিলালকে ধ'রে তার

পূর্বের বিছানায় শুইয়ে দিলাম। বললাম: শোও! তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই!

বিনা আপত্তিতে শুয়ে পড়লো মণিলাল। চোখ বুজেই বললো: মাথায় হাত বোলাবি? বোলা?

এত দুঃখেও হাসি পেলো ওর কথায়? মাতলামো করচে, কিন্তু বদমাইশি বুদ্ধিটুকু আছে আঠারো আনা। কথার বাঁধন ঠিক আছে। ঘরের আলোটাকে নিভিয়ে দিয়ে তার মাথার পাশে ব'সে তার চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগলাম। একটু ঘুমুক। ও ঘুমুলে আমার মুক্তি।

রাস্তার বিজলী আলো এসে পড়েচে জানালার কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে, মণিলালের বিছানার উপরে। একটু পরেই মণিলালের নাকে ঘড়ঘড়ানি শব্দ শুরু হ'লো। নাক ডাকচে তার! তবু একটু অপেক্ষা করলাম, ঘুমটা একটু গাঢ় হোক।

না, ঘুমিয়েচে মণিলাল। অতি সাবধানে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আঃ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মুক্তি! দায়মুক্ত। প্রভাকে দেখতে পাওয়া গেল না বারান্দায়। রান্না ঘরে আলো জ্বলচে; হয়তো ওখানে! ভালোই, দেখা হলো না। বিদায় নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। এসেচি অনাহুত, অবাঞ্ছিত—যাবো স্বেচ্ছায়; ভাববার কিছু নেই। ঘুরে দাঁড়ালাম, মণিলালের ঘরের সামনে। আস্তে করে তার ঘরের দরজার পাল্লা দুটো টেনে ভেজিয়ে দিলাম—বাইরের আলো বা আওয়াজ যেন ওর কানে না যায়। তা ছাড়া যা ঠাণ্ডা!

যাক্, বাঁচা গেল! মুক্ত হলাম দায় থেকে।

এদিকে আসুন! চমকে ফিরে দাঁড়াতেই প্রভা চাপা গলায় বললো:

একবার এদিকে আসুন তো!

কোথায়? গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলাম।

ঐ রান্নাঘরে। রান্নাঘর দেখালো প্রভা!

আপত্তি করলাম: না, আমি যাবো না। হোটেলে আমার খাবার তৈরি আছে।

কে বলচে নেই, আর কেইবা বলচে আপনাকে খেতে?

অপ্রস্তুত হ'য়ে বললাম: আপনি বললেন যে রান্নাঘরে যেতে?

রান্নাঘরে গেলেই খেতে হবে, এমন কোনো কথা আছে?

তবে?

আপনি আসুন রান্নাঘরে। বলচি!

যেতে পারি, কিন্তু খাবোনা!

আপনি না খাওয়ার জন্যে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েচেন দেখচি! প্রভা ঠাট্টা করলো: কিন্তু ঘরে খাবার কিছু থাকলে তো খাবেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, অন্য দরকার আছে।

প্রভা আর না দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো। বিস্ময়াবিষ্ট আমি নিজেরই অজ্ঞাতে তাকে অনুসরণ করে রান্নাঘরে ঢুকলাম। দেখি মেঝেয় দুটি পিড়ি জোড়া দিয়ে তাতে ছেলেটিকে শোয়ানো, উনুন দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠচে। বুঝলাম, উনুন ধরাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, নিভে গেচে।

বাইরের ঠাণ্ডার জন্যে রান্নাঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রভা বললো: উনুনটায় হাওয়া দিতে দিতে চোখ দুটো জ্বালা করচে, তাও জ্বলচেনা। আপনি জ্বালান তো!

আমি?

হ্যাঁ, আপনি। কেন আপত্তি আছে?

না, তা নেই !

তবে ?

সময় নেই !

কিন্তু উপায় নেই। সময় একটু নষ্ট করতেই হবে। আমাকে জুটো খেতে হবে তো !

ঠিক তো ! প্রভার খাবার আমাকে দিতে গিয়ে নষ্ট হয়েচে মণিলালের মাতলামোর ফলে। আর সেজন্যে দায়ী তো আমিই। আমি এনেচি মণিলালকে এখানে, আজ রাত্রে। এ বাড়ীতে আজ রাত্রের সংসারে আমিই এনেচি ওলোট-পালোট। দায়ী আমিই। পালালে চলবে কেন ?

বললাম ঃ বেশ দিন দেখি ঘুঁটে, কেরোসিন, কাগজ। চেষ্টা করে দেখি, পারি কিনা। অভ্যেস তো নেই !

বাড়ীতে রাঁধা ভাত খেয়ে খেয়ে খুব বদ অভ্যেস করেচেন তো ? কত-দিন বিয়ে করেচেন ?

প্রভার কাটা কাটা কথার ভালো একটা জবাব মনে এলো ঃ বিয়ে না করলে বুঝি রাঁধা ভাত খাওয়া যায় না ? চমৎকার ধারণা তো ? সেই অহংকারে ডগমগ করেন নাকি ? ভাবলাম বলি ঃ আপনার স্বামীই তো বিয়ে না করা মেয়ের রাঁধা ভাত খেয়ে থাকে, আমি দেখেচি। কিন্তু বললাম না, ব্যথা পাবে মনে।

প্রভা বললো ঃ স্ত্রীদের ঘরে আনাই হয় রাঁধা ভাত পাবার জন্যে।

কিন্তু তাঁরা যদি জানতেন—বলেই থেমে গেলাম। একটা কাগজ মুচড়ে সরু করে তার ডগায় দেশলাই জেলে ঢুকিয়ে দিলাম উনুনের গর্তে।

প্রভা পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সেলফ্ থেকে কোনো জিনিষ নিচ্ছিল। শব্দ পাচ্ছিলাম।

৬

বললো : কী, থামলেন কেন ? তাঁরা যদি কী জানতেন ?

জানতেন, কী কষ্টেই তাদের রাঁধা ভাত তরকারি তাদের স্বামীদের খেতে হয়, অবশ্য আমি সবার রান্নাই যে খারাপ তা বলচিনে ! আহা, সে সব হতভাগ্য স্বামীদের খাওয়ার সময় মুখের অবস্থাটা যে কি হয়, দেখেন না বোধ হয় ঐসব অহংকারে ফেটে পড়া স্ত্রীরা ! আর, স্বামীগুলোও তেমনি ! খাচ্চে নুনে পোড়া তরকারি, তবু মুখঝামটার ভয়ে মুখে বলবে মরি মরি !

ও, নুনে পোড়া তরকারি খাবার ভয়ে খেতে চাচ্ছিলেন না বুঝি ? তা আমি তো আপনার স্ত্রী নই যে মুখ ঝামটার ভয়ে বলতে হবে, মরি মরি ?

যদিও প্রভার দিকে পিছন ফিরে ব'সে উনুন জ্বালবার চেষ্টায় ছিলাম, তবু বেশ বুঝলাম প্রভার ঐ নির্লজ্জ কথাটার সঙ্গে মেশানো আছে তার বিদ্রূপের হাসি ! লজ্জায় আমার কান দুটো গরম হ'য়ে গেলো। কানে এলো প্রভার কথা : বরং পরস্ত্রীর হাতে নুনে-পোড়া তরকারি, পুরুষের কাছে সত্যিই মরি মরি হয়ে উঠে !

বললাম : হতে পারে। তখন বোধ হয় ঐ সব হতভাগ্য স্বামীদের স্ত্রীরা পরপুরুষদের জন্যে মনপ্রাণ দিয়ে রান্না করে। মনের ভুলে এক তরকারিতে দুবার ক'রে নুন দেয় না। আসলে স্বামী হচ্চে হস্তগত জীব। শেকলে বাঁধা। অবহেলা করলেও হারাবার ভয় নেই। অতএব নজর রাখতে হয় না পাওয়া জিনিষটির দিকে। যেটা নিজের নয় সেইটাই যে বেশি সুন্দর !...কৈ দেখি পাখাটা দিন তো। হাওয়া করতে হবে।

পাখা আপনার পেছনেই।

হাত বাড়িয়ে পেছন থেকে পাখাটা নিয়ে উনুনে হাওয়া করতে লাগলাম।

কথাগুলো একতরফা হচ্চে নাকি? প্রভা বললো: শুনুন বলি, শুধু পর-পুরুষ হলেই হয় না —সে পর-পুরুষ মেয়েমানুষের মনের মানুষ হওয়া চাই। নইলে, ইচ্ছে করেই দুবার কেন, তরকারিতে দশবার নুন দিয়ে তরকারি এমন পুড়িয়ে রাখে যে, সে পরপুরুষের মুখ যায় পুড়ে। সে মুখপোড়া আর সে মেয়েমানুষের দিকে মাড়ায় না। বুঝলেন মশায়!

প্রভা আমার খানিকটা দূরে সামনাসামনি একটা জলচৌকি পেতে বসলো। সামনে একটা থালা রেখে তাতে ঢাললো ময়দা। জার থেকে ঘি নিয়ে ময়দার সঙ্গে মাখতে লাগলো: মেয়েমানুষে সব পারে। নুন না দিয়ে বিস্বাদ করতে পারে, ঠিকমত নুন দিয়ে স্বাদ আনতে পারে, আবার নুনে পোড়াতেও পিছপা হয় না।

তা তো বটেই! বললাম: লবণ জিনিষটা তো আপনাদেরই আওতারে। লাবণ্য যে মেয়ের নেই, তার কিছু নেই।

ময়দায় জল দিলো প্রভা আন্দাজ মতো: কিন্তু সে লাবণ্যই বা দেখবার মতো, বোঝবার মতো চোখ বা মন আছে ক'টা পুরুষের? বন্ধ আপনারা।

উনুন ধরে উঠলো। আমিও পাখা ফেলে উঠে দাঁড়ালাম।

উঠলেন যে! প্রভা প্রশ্ন করলো।

উনুন তো ধরেচে! এবার যাই! বললাম।

যেতে পারেন। তবে দয়া করে উনুনে জল ঢেলে দিয়ে যান। কয়লাটা বাঁচবে।

বিস্মিত আমি বললাম: কেন?

কে এখন এই শীতের রাত্রে একলা ব'সে ব'সে রান্না করবে! আর কার জন্যেই বা?

কেন? আপনি খাবেন না? আপনার খাবারটা তো নষ্ট হলো!

হলোই তো! আপনার জন্যেই নষ্ট হলো। কিন্তু দেখেচেন কোনো মেয়েমানুষকে নিজের জন্যে এত জোগাড় যন্তর ক'রে আবার রান্না করতে বসে? খুব তো এতক্ষণ মেয়েদের মনস্তত্ব আওড়াচ্ছিলেন!

প্রভা ময়দা ঠাস্‌ছিল। মনে হলো যেন আমাকে ঠাস্‌চে: বিয়ে তো করেন নি—অথচ মেয়েদের বিষয়ে অসীম জ্ঞান অর্জন করেচেন তো? অথচ ঘোরতর সংসারী স্বামীও তো দেখি স্ত্রীর মন খুঁজে পায় না!

ওটা কি জানেন! মনের মতো জবাব পেলাম খুঁজে: মিছিল দেখেচেন, মিছিল? যারা মিছিলে যোগ দেয় তারা মিছিলের সব রূপটা দেখতে পায় না। দেখে, যাঁরা মিছিলের বাইরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েদের সঙ্গে ঘর করিনি, তাই মেয়েদের রূপ আমার কাছে অজানা নেই। ঘর করতে গেলে নিজেকেই হারিয়ে বসতে হতো।……আর না, রাত হয়ে যাচ্চে! আমি যাই। আপনি খাবার তৈরি ক'রে নিন। না খেয়ে আমার পাপের মাত্রা বাড়াবেন না!

প্রভা হাসলো: পাপের মাত্রা বুঝি এখন কম আছে? আর বাড়াতে চান না।

হাসলাম: না।

বেশ। তবে ঐ ছোট কড়াটা উনুনে চাপান্।

মানে?

আমি লুচি বেলি, আপনি ভাজুন। পারবেন তো? না পারেন শিখিয়ে দেবো। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, বিশেষ ক'রে আপনাদের মত ব্যাচিলর মানুষদের সব শিখে রাখা দরকার। কৈ, চাপান্ কড়াটা?

নাঃ, মুস্কিলে ফেললেন দেখচি। বিরক্ত হয়েই ছোট এলুমিনিয়মের

কড়াইটা উনুনে চাপালাম। পৌরুষে আঘাতও লাগলো বৈকি? একটি সামান্য নারী নিজের ইচ্ছে মতো আমাকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বিবেকের তাড়নাও মনকে ধমকাচ্চে। আমারই দোষে, একটি মানুষের রাত্রে খাওয়া হবে না।

নিন্, এইবার এই জার থেকে ঐ চামচে দিয়ে ঘি বা'র ক'রে ঐ কড়াতে দিন।

প্রভার নির্দেশ মতো কাজ করলাম। প্রভা বললোঃ ঘিটা গ'লুক, আমি ততক্ষণে নেচিগুলো ক'রেনি!

উত্তর দিলাম না কথার। চুপ ক'রে ভাবছিলাম, শিলংয়ে এসেছিলাম বেড়াতে; হোটেলে থাকবো, খাবো, বেড়াবো—কে জানতো, এই রাত্রে এক অপরিচিতা নারীর নির্দেশে তার রান্না ঘরে বসে আমাকে লুচি ভাজতে হবে? সত্যি, পুরুষের ভাগ্যে যে কি থাকে—

কী ভাবচেন? প্রভা আমাকে প্রশ্ন করলো।

কিছু না।

কলকাতার কথা ভাবচেন বুঝি?

না।

প্রভা মুচকে হেসে বললোঃ সেখানে কারোর কথা ভাববার মতো কেউ নেই বুঝি?

না!

আশ্চর্য তো?

কেন বলুন তো?

না, এমনি বলছিলাম।…ঘি গলেচে?

হু।

প্রভা চাকি বেলুন নিয়ে লুচি বেলতে লাগলো। একখানা থালার উপর বেলা-লুচি রেখে বললোঃ ঐ নিন। আস্তে ক'রে তুলে কড়াতে দিয়ে ঐ ঝাঁঝরা দিয়ে উল্টে-পাল্টে দিন।

প্রভার কথামত লুচিখানাকে উল্টে-পাল্টে দিতেই ফুলে উঠলো।

বাঃ, বেশতো ফুলে উঠেচে। প্রভা সোৎসাহে বলে উঠলোঃ একবার বলতেই শিখে ফেলেচেন তো? অনেকেই পারে না কিন্তু!

এতে আমার কিন্তু কোন বাহাদুরি নেই।

কেন? প্রভা যেন আশ্চর্য হয়ে গেলো।

আপনার বেলার গুণেই ফুলচে!

তাই নাকি? আমার গুণ আছে তাহলে? আমার কোনো গুণই কিন্তু আপনার বন্ধুটির চোখে পড়ে না। কোনো গুণ নেই মোর কপালে আগুণ! ওঁর বিয়ে করা বৌ কিনা!···নিন, ঝাঁঝরাতে তুলে ঘিটা ঝরিয়ে ওখানা এই গামলাতে রাখুন।

প্রভা এগিয়ে দিলো একটা গামলা। গামলাতে লুচিখানা রাখতে গিয়ে নজর পড়লো নেচিগুলোর দিকে। অনেকগুলো!

অতগুলো নেচি কি হবে?

লুচি হবে।

অতগুলো কেন?

খাবো! দুটো খাওয়ার জন্যেই তো এত কষ্ট সহ্য করে পড়ে আছি এখানে। বাপ-মায়ে বিয়ে দিয়েচে ভাল ঘর দেখে, বর দেখে—যাতে দুটো খেতে পাই; আর আপনি ভয় পাচ্চেন আমার খাওয়া দেখে!

কিন্তু একটু আগে আপনিই বলেছিলেন উনুনে জল ঢালতে!

কিন্তু সত্যিই কি আপনি জল ঢালতে পারতেন, না, আমি দিতাম?

যাক্, ঠিক ক'রে বলুন তো, অত লুচি ভেজে কি হবে? আমি কিন্তু খাবো না!

কে আপনাকে খেতে বলেচে? প্রভা লুচি বেলতে লাগলো: এখন লুচিগুলো ভেজে ফেলুন তো। নইলে সব জড়িয়ে যাবে!

অগত্যা, অনভ্যস্ত হাতে লুচি ভাজতেই লাগলাম চুপচাপ। দেখা যাক্, কোথাকার শ্রাদ্ধ কোথায় গিয়ে গড়ায়! তবে মন অস্বস্তিতে ভরা। লোকে দেখলে কি বলবে? নির্মম শীতের নির্জন রাত্রে রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে এক অল্প পরিচিতা নারীর নির্দেশে তারই খাওয়ার জন্যে উনুনের পাশে ব'সে লুচি ভেজে দিচ্চি। কেন, প্রশ্ন কেউ করলে তার সদুত্তর দেওয়া যাবে কি? বেশি কি, মণিলাল যদি জেগে ওঠে, আসে রান্নাঘরে, দেখে আমাকে এভাবে তার স্ত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে লুচি ভাজচি—সে কী ভাববে? ভাববে নাকি, লুচি ভাজাটা অজুহাত মাত্র তার স্ত্রীর সঙ্গে একলা নির্জনে কাটানোই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য? তার অচৈতন্য অবস্থার সুযোগ নিচ্চি আমি?

ও কি হচ্চে? তুলুন তাড়াতাড়ি! প্রভার কথার ধাক্কায় মণিলালের কাছ থেকে মন ফিরে এলো ঘিয়ের কড়াইয়ে।

দেখুন তো, লাল হয়ে উঠেচে। পুড়ে যেতো আর একটু হলে?·· কী ভাবচেন?

কিছু না। লুচিটাকে গামলায় রেখে আর একখানা কড়াইতে ছাড়লাম।

ভয় পাচ্চেন নাকি? প্রভা কি আমার কথা জানতে পারলো?

না তো! ভয় কিসের! শুকনো হাসলাম।

আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন! প্রভা একটা নেচিতে তেল মাখিয়ে চাকির উপর ফেলে বেলনার চাপ দিয়ে লম্বাটে করে দিলো। পরে

পরে সেটাকে ঘুরিয়ে অভ্যস্ত হাতের আর এক টানে দিলো গোল ক'রে। মাথাটা নীচু করেই ছিলো, নীচু গলায় বললো :

আপনি পুরুষ মানুষ, আপনার ভয়টা কিসের ? ভয় তো আমার পাওয়া উচিত !

কেন বলুন তো !

একলা এই রাত্রে এক ঘরে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে থাকা—মেয়ে মানুষের ভয় করে না বুঝি ? হ'লেই বা স্বামীর বন্ধু !

রাগ হলো। বললাম : ইচ্ছে করে যদি ভয় পেতে চান, আমি কি করতে পারি বলুন ? যেতে চাচ্ছি, তাও ছাড়বেন না ; আবার থাকলেও ভয় পাচ্চেন, আমি চলি বরং। আপনি ভাজুন লুচি !

না না যাবেন না। প্রভা ব্যস্ত হয়ে পড়লো : আসল কথাটা বলি তা'হলে, আমার বড্ড ভূতের ভয় ! হঠাৎ নজর পড়লো, প্রভার মুখে মৃদু হাসি।

ভূতের ভয় ! কঠিন স্বরেই বললাম : একলা থাকেন কী ক'রে ? রাত্রে রাঁধেন না ?

না দিনের বেলাতেই সব রান্না শেষ করে রাখি। সন্ধ্যেবেলায় ক'খানা রুটি করি। ছেলেমেয়েরা জেগে থাকতেই সব কাজ কম্মো সেরে, তাদের খাইয়ে নিজে খেয়ে দরজা-জানালা এঁটে সেঁটে বন্ধ করে তাদের নিয়ে একেবারে লেপের তলায়।

আর মণিলাল যখন আসে ?

মাসের মধ্যে আদ্দেক দিন তো আসেন না। প্রভা দিব্যি ব'লে গেলো : আর যে রাত্রে আসেন, হোটেল থেকে খেয়ে আর গিলে আসেন। আসেন শুতে ! আসার কোনো ঠিক নেই। হঠাৎ আসেন। দেখেন

বোধ হয়, ঘরে অন্য পুরুষমানুষ নিয়ে আছি কি না। খুব সন্দেহ বাই! লুকিয়ে থেকে দেখেচি, বাড়ি এসেই টলতে টলতে বাথরুম দেখেন, চৌকির তলা দেখেন। শেষে হতাশ হ'য়ে ধড়াস ক'রে বিছানায় প'ড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকেন মড়ার মতো। নিজে মেয়েমানুষ রেখেচেন কিনা, তাই মনে করেন, আমিও বুঝি অন্য পুরুষমানুষ নিয়ে ঢলাঢলি করচি।

চুপ করে শুনছিলাম প্রভার করুণ কাহিনী! কাহিনী করুণ হতে পারে, প্রভার গলার স্বর করুণ হয়নি! গা-সয়ে যাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বলার মতোই তার গলার স্বর স্থির, শান্ত, স্বাভাবিক। বরং আমারই মনের ভিতরটা কোন সময় আপনা থেকেই নরমে এসেছিল!

কড়াইয়ে সদ্যফেলা নরমে থাকা শেষ লুচিখানা ঝাঁঝরি দিয়ে দু-চার বার উল্টে-পাল্টে ফুলিয়ে ভেজে গামলায় রেখে বললাম: এইবার ওঠা যাক্! শেষ হলো তো ভাজা?

তা হলো। প্রভা চাকি-বেলনা গুছিয়ে রাখলো: এবার একটু আলুর তরকারি করে নিই। তা হলেই হয়ে যায় সব। আপনি উঠুন বরং!

উঠে দাঁড়ালাম। জামা কাপড় টেনে ঠিকঠাক করে বললাম: আচ্ছা যাওয়া যাক এবার। মণিলালকে বলবেন, আমি গেলাম!

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রভা বললো: ওঃ পালাতে পারলে বাঁচেন দেখচি! তবে থাকলো রান্না। বললাম না, আমার ভূতের ভয় করে! ভয় নেই, কাল সকালে বলবোখন, বন্ধু তোমার তক্ষুনি চলে গেচেন। আমার দিকে চোখ তুলেও দেখেন নি। হয়েচে তো!

আচ্ছা অসভ্য মেয়ে মানুষ তো! নির্লজ্জ! মুখে কোন কথা আটকায় না। আমাকে নিয়ে বেশ খেলা শুরু করেচে। আর আমিও

দেখচি, বোকার মতো ওর কথায় নাচছি! না, ঠিক করলাম, যেতেই হবে। আর না। আর অনেক দেরিও হয়ে গেচে। এর পরে হোটেলে ঢোকাই মুস্কিল হবে!

আমি আর থাকতে পারবো না। আমি চললাম। রান্না ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করতেই এক ঝলক ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া মুখের ওপর খানিকটা ছুঁড়ে দিয়ে গেলো যেন: উঃ, কী ঠাণ্ডা বাইরে।

হোক ঠাণ্ডা! পা বাড়ালাম দরজার বাইরে। কিন্তু বাধা পেলাম পেছন টানে।

দাঁড়ান মশায়! আমার লং কোটের শেষ প্রান্ত টেনে ধরেচে প্রভা: বন্ধ করুন দরজা। ঠাণ্ডা লাগবে ছেলের। এখুনি জেগে উঠলে কোনো কাজই করতে দেবে না।

অগত্যা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বললাম: খুব মুস্কিলে পড়লাম তো!

তা একটু পড়েচেন! জামা ছেড়ে প্রভা বললো: আপনার লজ্জা করে না? একজন বিরহকাতরা, স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা নারী আপনার সঙ্গ কামনা করচে—আর আপনি কিনা ভয়ে পালাচ্চেন। লোকে শুনলে কি বলবে! অন্য পুরুষদের কানে এ কথা গেলে তারা আপনাকে একঘরে করবে, তা জানেন?

করুক একঘরে!

তবু আমার সঙ্গে একঘরে থাকতে এত ভয়!

ভয় নয়। প্রয়োজন নেই!

কী করে জানলেন? আমার কিন্তু বড় প্রয়োজন আপনাকে! প্রভা হাসলো: নইলে ঐ যে অতগুলো লুচি সব নষ্ট হবে। গেরস্তর এতে

লোকসান। শুধু তাই নয়, গেরস্তর অমঙ্গল হবে।

কেন?

কেন আবার? এলেন, বন্ধুর লাথির কৃপায় মুখের খাবার পেটে গেলনা, গড়াগড়ি খেলো। আবার কেন?

কিন্তু খাবোনা, আগেই তো বলেচি!

আপনি বললেই হবে? প্রভা বঁটি নিয়ে আলু কুচোতে লাগলো: গৃহলক্ষ্মী আমি। অতিথি এসে অমঙ্গল করে যাবেন না খেয়ে—আমি তাই হতে দেবো। আজ্ঞে অত কাঁচা গৃহিনী আমি নই। বাড়ির কর্তা, অচৈতন্য, বেহুঁস বটে; গিন্নির হুঁস আছে ষোল আনা।

গিন্নির হুঁস দেখেই বোধ হয় কর্তা বেহুঁস হয়ে থাকেন?

প্রভা অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো: সব সময়ে না কিন্তু! সাহসী হতে গেলে বিপদে পড়তে পারেন।

বললাম: সৎসাহস যথেষ্ট আছে! দুঃসাহস দেখাবার উৎসাহ নেই! নিশ্চিন্ত হোন! এখন পেটে আগুন জ্বলচে, মনে নয়। এই বসলাম পিঁড়ি পেতে। দিন খেতে! খেতেই যখন হবে—তখন খাওয়াই যাক।

দেওয়ালে খাড়া করা পিড়ি একখানা পেতে বসলাম চেপে!

এই দেখুন তো, কি হলো! বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল চেপে ধরলো: যা তাড়া দিলেন, তাড়াতাড়িতে আঙুলটাই গেল কেটে।

অপ্রস্তুতে পড়লাম। ঝুঁকে পড়লাম প্রভার চেপে ধরা আঙুলের দিকে: দেখি, দেখি!

কেন, বিশ্বাস হচ্চেনা? এই দেখুন। বাঁ হাত ছেড়ে দিতেই দুতিন ফোঁটা রক্ত পড়লো মাটিতে। তবে বেশি কাটেনি।

ব্যস্ত হয়ে উঠলাম: ওকি করচেন। চেপে ধরুন! কী করা যায়

বলুন তো!

প্রভা আঙুল চেপে ধরে বললো: আমি তার কি জানি?

টিন্‌চার আইডিন নেই বাড়িতে?

না।

একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিলে হ'তো! ফর্সা ন্যাকড়া আছে?

প্রভা নির্বিবাদে বললো: আপনার ধুতিটা তো ফর্সা। ছিঁড়ুন না কোঁচার কোন্‌টা। নভেলে পড়েননি, তরুণরা হলে এ সময়ে পড়্ পড়্ করে নিজের ধুতি ছিঁড়ে জড়িয়ে দিতো মেয়েটির কাটা আঙুল!

নিজের রসিকতায় হি-হি করে হেসে উঠলো প্রভা।

প্রভার সে হাসি ছ-র-রা গুলির মতো বিঁধলো আমার গায়ে। বললাম: নভেলে যা পড়েন, বাস্তবে তা হয় না। মাত্তর দুতিনখানি কাপড় নিয়ে বিদেশ এসেচি; তা ছাড়া ধুতির দাম—যাক্, এক কাজ করুন, আঙুলটা মুখে ভরুন, চুষুন—এখুনি রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি নিজের রক্ত নিজে চুষে খাবো? রাক্ষসী নাকি?

বেশ তবে ঐ শাড়ীর আঁচলে জড়িয়ে নিন আঙুল! বললাম: আর দরকার নেই তরকারি রান্না ক'রে। চিনি আছে? গুড়? যা হয় দিন। চিনি বা গুড় দিয়ে গরম লুচি ভালোই লাগবে খেতে!

উঃ, কি নিষ্ঠুর লোক আপনি! প্রভা কাটা আঙুল শাড়ীর আঁচলের এক কোনে জড়াতে জড়াতে বললো: আপনার প্রাণে কি কোনো দয়ামায়া নেই?

বোধ হয় নেই। বললাম: কৈ, দিন চিনি আর লুচি!

চিনি ফুরিয়ে গেচে আজ।

গুড় ?

তাও নেই।

বেশ, তবে শুধু লুচিই খাবো। তাতেই গৃহস্থের মঙ্গল হবে বলচি।

কিসে মঙ্গল-অমঙ্গল হয়, আমি জানি। আপনাকে শেখাতে হবেনা। আপনি বসুন চুপ ক'রে। তাড়া করবেন না, পারবোনা।

অগত্যা চুপ করে রইলাম। প্রভা শাড়ি জড়ানো কাটা আঙুল নিয়েই আরো কতকগুলো আলু কুচিয়ে আলুর তরকারি রাঁধতে শুরু করলো। আমি প্রভার পেছনে বসে দেখতে লাগলাম তাকে। মাথায় ঘোমটা। খোঁপাটা আলগা জড়ানো। পিঠের ডান দিকটায় কাপড় নেই, শুধু চকোলেট রংএর গরম ব্লাউজটা দেখা যাচ্চে। হাতাটা নেমে এসেচে কনুই পর্যন্ত। জল চৌকির উপর বসে রাঁধচে। খুন্তি নাড়ার তালে তালে ডান হাতখানা নড়চে, নড়চে যৌবন-গড়ন।...ঈশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি ঐ নারী। কখনও লজ্জায় নতমুখী, কখনও বা নির্লজ্জতায় শতমুখী। এরাই দেবী, এরাই দানবী। এরাই জননী, এরাই—

কী একেবারে চুপ হয়ে গেলেন যে ? পেছন ফিরেই প্রভা বললো।

কী করবো ? চেঁচাবো ?

না, না। ছেলে জেগে উঠবে !

তবে ?

গল্প করুন !

ভূতের গল্প ?

করতে পারেন। সারারাত্রি এখানে থাকতে হবে তাহলে।

মাপ করবেন। কোন গল্প বলেই দরকার নেই। গল্প শুনতে গিয়ে শেষে অন্যমনস্ক হ'য়ে হাত পোড়াবেন, কিংবা কাপড় !

আজ্ঞে না। প্রভা বললো: কোন কিছু পোড়বারই ভয় নেই, খুব মন দিয়েই রাঁধচি! খেয়ে দেখলেই বুঝবেন। ঠিক মতই নুন দিয়েচি তরকারিতে, জানেন? ভয় নেই, মুখ পোড়াবোনা আপনার!

ইঙ্গিত বুঝলাম। তবে না বোঝার ভান করেই বললাম: আপনার দয়া!

হুঁ, দয়াই করলাম। প্রভা বললো: আপনার গলায় সোনার যে ভারি গুড্-কনডাক্টের মেডেল ঝুলচে জল জল ক'রে—তাতে আপনার মুখোজ্জ্বল হতে থাকুক। তার ভারে শিরদাঁড়া আপনার আরো নত হোক্!

তা হোক্, আপত্তি নেই। বললাম: কিন্তু মুখে কালি মেখে শিরদাঁড়া উঁচু করে বেড়ানোতে কোনো বাহাদুরি দেখিনে! যাক্, লোকের রুচি বিভিন্ন; তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই! আপাততঃ গৃহস্থের মঙ্গল করবার সুযোগটা দিতে আর কত দেরি?

বেশী না। হয়ে এলো। আপনি ততক্ষণ ঐ থালাটা টেনে নিন। লুচিও নিন যতগুলো পারেন। আর নুন আছে ঐ ভাঁড়ে। একটু হাত বাড়িয়ে নিন তো!

প্রভার কথামতো খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিলাম।

মনে মনে খুব রাগচেন? না? খুব হুকুম করচি, আপনাকে দিয়ে খাটাচ্চি।

এতে রাগ করবার কি আছে? হাসলাম: আমার খাওয়ার জন্যই আমাকে খাটাচ্চেন। আবার খাটিয়ে খেতে দিচ্চেন, এতে অন্যায় কোথায়? এই তো নিয়ম!

যাক্, বাঁচা গেলো। প্রভা বললো: অন্যায় দেখে দেখে আর অন্যায়

ক'রে ক'রে, অন্যায় ছাড়া যে কিছু করতে পারি—ভাবতেও পারিনে। বোঝা গেলো, আশা আছে! একটা সার্টিফিকেট লিখে দেবেন?

দিতে পারি! তবে খাটার অনুপাতে খাওয়াটা ঠিক হলো কিনা দেখে।

দেখুন তবে! উনুন থেকে কড়াই নামিয়ে খুন্তিতে করে খানিকটা তরকারি ঢেলে দিলো আমার পাতে!

শীতের রাত্রে খিদের মুখে গরম আলুর তরকারি দিয়ে সবে-ভাজা লুচি, কী যে মধুর আস্বাদদায়ক—তা মুখ দিয়ে বলতে গিয়ে মুখ বন্ধ করতে চাইলো না মন!

কী কেমন হয়েচে? সংশয় মেশানো প্রশ্ন করলো প্রভা।

চমৎকার!

ঠাট্টা করচেন।

তরকারিটা সত্যিই ভালো হয়েছিলো, তাই কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে বললাম: এতক্ষণ আপনার অনেক ঠাট্টা-চালাকি বাক্য যন্ত্রনা সহ্য করেচি, খিদের সময় কিন্তু ওসব ভালো লাগেনা। ভালো রান্না ভালো ক'রে একটু খেতে দিন! গৃহস্থের মঙ্গলের পারা থার্মোমিটারে চড় চড় ক'রে উঠেচে, এখন বেশি বকালে গলায় খাবার যাবে আটকে। তখন জল, খেতে আর মাথা থাবড়াতে হবে এমন যে, মঙ্গল পারা ঝরঝর করে নেমে আসবে একেবারে জিরোতে। এমন কি, আরও নেমে গিয়ে কোলাপ্স্ মেরে যেতেও পারি!

কোলাপ্স্ মারুন, ক্ষতি নেই। একটা সার্টিফিকেট কিন্তু চাইই।

কেন? সার্টিফিকেটের এত তাড়া কেন? রাঁধুনীগিরির চাকরি করবেন নাকি?

করতেও তো হতে পারে। বন্ধুর আপনার এখন দু' সংসার এবং

ছ' গিন্নী। এক বনে দুটো বাঘিনী থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এক সংসারে দু' গিন্নী থাকা অসম্ভব। বুঝলেন? কাজেই সুয়োরাণী যদি কোনদিন এ সংসারে আসেন, এই দুয়োরাণীকে দূর হতেই হবে! কাজেই আগে থেকে ব্যবস্থা ক'রে রাখা ভালো নয় কি? শুনে রাখি, আমাকে রাখবেন রাঁধুনী?

কেন? রাঁধা ভাত খেতে? সেজন্য তো বিয়ে করা বৌ দরকার, রাঁধুনীর নয়! অন্ততঃ আপনি তো তাই বলেছিলেন? না?

হ্যাঁ! প্রভা এক কেট্‌লি জল উনুনে চাপিয়ে বললো: আপনি তাহলে রাঁধা ভাতের জন্য বৌ ঘরে আনতে রাজি আছেন?

গররাজি হবার কারণ দেখিনে। দাঁত পড়েনি, চুল পাকেনি। নিরাশ হবো কেন?

তবে অবশ্য, অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করতে হবে। তবে ভাগ্যে জুটবে কিনা জানিনে!

কেন?

আমার সার্টিফিকেট্ না হয় আপনি দিলেন? কিন্তু যে বাড়িতে রাঁধুনীর কাজে যাবো, সে বাড়ীর কর্তার বা কর্তার ছেলের সার্টিফিকেট কে দেবে? নইলে, বাবুদের কেউ যদি রাঁধুনীর হাতের রান্নার চেয়ে, রাঁধুনীর হাতখানাই বেশী লোভনীয় মনে করেন তবেই তো গেছি-রে বাবা!···আর দুখানা লুচি দিই?

গুণে দুখানা। বললাম: আমার বেলায় সে ভয় নেই বুঝি?

না, বাজিয়ে দেখেছি। পাতে দুখানা লুচি দিলো প্রভা।

যাক! সার্টিফিকেট তাহলে আমারও চাই একখানা। বন্ধু বান্ধবদের অন্দরমহলে ঢোকবার পাশপোর্ট হবে সেখানা!

শুনেচি, পাশপোর্টের জন্যে ছবি দরকার। ফটো আছে আপনার ?

না।

তবে হবে না। ফটো চাই !

বললাম ঃ ফটো চাইচেন, তাতে আপনারি ক্ষতি কিন্তু !

প্রভা বললো ঃ মেয়েমানুষের যেটুকু ক্ষতি হবার তাতো হয়েইচে ! এবার তো লাভও হ'তে পারে ? কবে দিচ্চেন ছবি বলুন !

কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

না, সে দেরি হবে। এখানেই বরং তোলান না কেন ? কবে যাচ্চেন কলকাতায় ?

হয় কাল। নইলে পরশু নিশ্চয়ই।

আজ্ঞে না।

অবাক হলাম ঃ তার মানে ? বললাম ঃ এসেচি নিজের ইচ্ছেয়, যাবোও নিজের ইচ্ছেয়, আপনার ইচ্ছেয় নয়।······কৈ দেখি, কেটলির গরম জলটা দিন, হাতটা ধুই।

আঁচলের কাপড় দিয়ে গরম কেটলিটা প্রভা উনুন থেকে নামিয়ে একটা গেলাসে খানিকটা গরম ও ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে এগিয়ে দিলো আমার দিকে ঃ একটু দরকার ছিল তাই বলছিলাম থাকতে।

আরো অবাক হলাম ঃ আমাকে দরকার ? থালার উপর হাত ধুতে ধুতে বললাম ঃ যখন এসেছিলাম আজ সন্ধ্যায়, তখন তো আপনার মুখের চেহারায় বা কথার ভংগীতে সে রকম কিছু বোঝা যায়নি ! হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি যে একটি প্রয়োজনীয় বস্তু—আপনার সে ধারণা হলো কি করে ?···উঠে দাঁড়ালাম। হাত ঘড়িটায় দেখলাম, রাত দশটা কুড়ি। বললাম ঃ সাড়ে দশটা বাজে। আর না। অনেক দেরি হয়ে গেচে।

আমারই জন্যে সেটা। প্রভা বললো: সত্যি, অনেক দেরি করে দিলাম আপনার! না হয়, এক কাজ করুন না? রাতটা এখানেই থেকে যান না?

ঠাট্টা করেই বললাম: বটে, খেতে পেলে শুতে চায় ক্লাশের লোক ভেবেচেন আমাকে? চলি। আসুন, সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যান। কিন্তু একটা কথা?

কি?

বললাম: সামনে থাকলে খাবেনও না, আর থাকবার সময়ও নেই! রাত্রে কিন্তু খাবেন!

আজ্ঞে, সেটা আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করচে!

তার মানে, খাবেন না?

নিশ্চয়ই খাবো। আগে কাঁদতাম, খেতাম না। এখন কাঁদিওনে উপোসও করিনে। কার জন্যে করবো? কাকে দেখিয়ে করবো? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। দেরি করবো না মোটেই, খিদে পেয়েচে বেশ।

আর তাহলে দেরি করবো না। রান্নাঘরের দরজা খুলে বাইরের ঠাণ্ডায় এসে জুতো পরলাম। আমার পেছনে প্রভা এলো দরজা ভেজিয়ে দিতে।

কলকাতায় যাবার আগে একবার দেখা দেবেন কি?

চলতে চলতে বললাম: বলতে পারচিনে। হয়তো, না।

পেছনে প্রভা বললো: কেন, আপত্তি কি?

সময় নেই। ঘুরে দাঁড়ালাম সদর দরজার কাছে: আচ্ছা, কি এমন দরকার বলুন তো?

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবার নয়! আচ্ছা আপনি আসুন। নমস্কার।

অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম। এক ঝটকায় প্রভা যেন বিদায় দৃশ্যের উপর যবনিকা টেনে দিলো। চলে যাওয়াটা হবে আচমকা, অথচ অশোভন হবে দাঁড়িয়ে থাকা। ধাক্কা-খাওয়া মন, হাত দুটোকে দরজা খোলবার কাজে লাগিয়ে দিলো। দরজাটা খুলে গেলো। হাত দুটো কখন যেন জোড়হাত হয়ে গেল। মুখ বললো: আচ্ছা, নমস্কার।

তারপর রাস্তায় পা দিতেই, পেছন থেকে কানে এলো 'ধড়াম্' ক'রে দরজা বন্ধ করবার শব্দ।

মণিলালের অচৈতন্য অবস্থায়, তার স্ত্রীর অনুরোধে যতক্ষণ তার বাড়ীতে আমাকে থাকতে হয়েছিলো, অত্যন্ত অস্বস্তিতে আমার মন ছিল ভ'রে। বিবেক আমাকে নিয়ে আচ্ছা যা হোক পুতুল খেললো। কখনো বলে: চলে যেওনা, অন্যায় হবে; আবার কখনো বলে: বোধ হয়, উচিত হচ্চে না এভাবে এক পরস্ত্রীর সঙ্গে একলা থাকা। মন কেবলি দোল খেতে লাগলো কি-করি, কি-করি। কেবলি মনে হচ্ছিল, কতক্ষণে ছাড়ান পাবো, পাবো মুক্তির আস্বাদ, ফেলতে পারবো স্বস্তির নিঃশ্বাস!

কিন্তু আশ্চর্য, রাস্তায় পা দিতেই, পেছন থেকে যখন কানে এলো অস্বাভাবিক জোরে 'ধড়াম্' ক'রে দরজা বন্ধ করবার শব্দ—সত্যি বলতে কি, বুকটার মধ্যেও আমার 'ধড়াস্' করে উঠলো। পা এগিয়ে যেতে লাগলো মণিলালের বাড়ী থেকে দূরে, ক্রমেই দূরে; কিন্তু মনটা যেন ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো ঐ বন্ধ দরজার সামনে। একটা বোবা বন্ধ দরজা যে এতটা নিষ্ঠুর হ'তে পারে, তা কোনদিনই মনে হয়নি! কেবলি মনে হ'তে

লাগলো, প্রভার হ'য়ে দরজাটা যেন বলচে : আমার কথা শুনলে না ? গেলে, চলে গেলে ? যাও ! আরো যেন বলচে : আমার মনের দুয়ার রইল বন্ধ। খুলে দেবো, তেমন বন্ধু তুমি নও, তুমি নও।

আমি বন্ধু নই তো ? বেশ, তবে চললাম। ধুলো পায়েই মন ঘুরে দাঁড়ালো। ছুটে এলো আমার কাছে, মিশে গেল চলা-আমির সঙ্গে। তাড়াতাড়ি চললাম হোটেলের দিকে। খানিকটা সঙ্গে চলার পর চঞ্চল মন বললো : তুমি এসো, আমি এগিয়ে যাই হোটেলে। সেখানে কী হচ্চে কে জানে ? দরজা ঠেঙাতে হবে হয়তো ! ম্যানেজারই বা কী ভাবচে ? অনেক রাত্রি হয়ে গেলো ! তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

কয়েক পা চলবার পর আরো জোরে চালাতে হলো, সর্বনাশ, টিপটিপ বৃষ্টি হলো শুরু। একটু পরেই ঝমঝম করে নামলো। পাহাড়ে বৃষ্টি ! মেঘ ডাকতে শুরু করলো ; বজ্রপাত হলো কিনা কোথাও জানিনে, বজ্রাঘাত হলো আমার মাথায় যেন। ছুটতে লাগলাম। নির্জন আধ-আঁধারি পথে অন্ধের মত কিছু না দেখেই ছুটতে লাগলাম। বৃষ্টির ঝাপটায় ভালো করে দেখাও যায় না কিছু। জামা কাপড় ভিজে সেঁটে গেচে গায়ের সঙ্গে, জুতো ভিজে হয়েচে জব্‌জবে ; বড় হয়ে গিয়ে ফটাস্ ফটাস্ করতে লাগলো পায়ে। খানিকদূর যাবার পর সামনে বারান্দাওলা একটা কাঠের বাড়ী চোখে পড়লো ! কার বাড়ী কে জানে—ছুটে গিয়ে বারান্দায় উঠলাম। বরফের টুকরোর মতো বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাক তো !

আমার এই দুরাবস্থা দেখে, মন হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলা ফেলে রেখে ছুটে এলো আমার কাছে। জিগ্যেস করলো : এখন কি করবে বলতো ?

আপাততঃ দাঁড়াই একটু !

ভাগ্য ভালো। বারান্দার কোনে একটা বেঞ্চি পাতা। গিয়ে বসলাম।

মন বললো : জামাটা খোলো। নইলে অসুখ করবে। বেশ ছিলে মণিলালের বাড়ীতে। এত হুড়োহুড়ি ক'রে না এলেই পারতে।

বটে! বটে! বিবেক তেড়ে উঠলো মনকে : ভারি মজা পেয়েছিলে! না? লজ্জা করে না?

মন বললো : বারে! লজ্জা পাবো, এমন কি করেচি আমি? আমার তো মনে হয়, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং মণিলালের বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভালো। হোটেল অনেক দূর।

না, না! বিবেক বাধা দিলো : সারারাত থাকতে হয়, সেও ভালো।

আমি বেঞ্চে বসে মন আর বিবেকের কথা কাটাকাটি শুনতে লাগলাম। আমার কি? যে তর্কে জিতবে, আমি তার কথামতই কাজ করবো।

বিবেক বললো : আর মণিলালই বা কি ভাববে?

মন উত্তর দিলো : বৃষ্টি পড়চে, তাই থেকে গেচি। এতে ভাবা ভাবির কী আছে?

প্রভাও তো ভাবতে পারে, সেই তো মল খসালি—

কিন্তু কে জানতো বৃষ্টি হবে।

বিবেক বললো : বুঝেচি, প্রভার সঙ্গ তোমার ভালো লেগেচে। কিন্তু বন্ধু-স্ত্রী ও!

কী বাজে বকচো? মন অস্বীকার করলো!

আমি অমন বাজে বকেই থাকি! যা ইচ্ছে করো! বিবেক বললো : বৌটার হাব-ভাব কিন্তু ভালো না। একটু নির্লজ্জ গোছের। যাবে যে বলচো, কি বলবে গিয়ে?

বলবো, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে ফিরে এলাম।

ওখানে শোবে কোথায় ?

কেন ? বাইরের ঘরটায়? যেখানে প্রথমদিন গিয়ে বসেছিলাম।

যদি দেখো, প্রভা ঘুমুচ্চে ?

ডেকে তুলতে হবে তা'লে।

তবু যেতে হবে ?

নইলে ভিজে অসুখ বাধাতে হবে ? ওখানে গেলে মণিলালের শুকনো জামা কাপড় পাওয়া যাবে।

সেই সঙ্গে বন্ধু-স্ত্রীর সেবা ? না ? ···যাও, যাও, হোটেলে যাও। ভিজেইচো, না হয় আর একটু ভিজবে।

অনেকটা পথ যে! তার উপর লোকজন চলাচল নেই রাস্তায়। শেষকালে গুণ্ডার হাতে পড়বো ?

এমন সময় এক ঝলক তীব্র আলো বৃষ্টির ধারা ভেদ করে গায়ে এসে ছড়িয়ে পড়লো। মটর গাড়ির হেড লাইটের আলো।

বিবেক বললো : ঐ গাড়িটাকে দাঁড়াতে বলো, শোনো কোথায় যাচ্চে। হোটেলের দিকে যায় তো ভালোই।

মন বললো : আপত্তি নেই ! দেখি চেষ্টা করে !

উঠে দাঁড়ালাম আমি। দৌড়ে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়ালাম রাস্তার মাঝখানে। হাত উঁচিয়ে রইলাম। ক্রমেই গাড়িখানা কাছে আসতে লাগলো। শেষে আমার ইশারায় থেমে গেল। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেচে। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কানে এলো রূঢ় কণ্ঠস্বর : কেয়া মাংটা ?

যানে মাংতা। এগিয়ে গেলাম ড্রাইভারের কাছে : পানিসে ভিজ গিয়া।

কাঁহা যায়েঙ্গে ?

জেল রোড। হামরা হোটেল মে।

আইয়ে ! কুছ্ চা পানিকা লিয়ে ডেনে হোগা।

জরুর !

উধারসে আইয়ে।

দেখলাম একখানা মালটানা লরী, মালে বোঝাই। ড্রাইভারের বাঁদিকের দরজা খুলে দিতেই উঠে বসলাম লরীতে।

লরী চলতে লাগলো। বিবেক বললো ঃ এইতো বেশ হলো।

মন বললো ঃ বেশ হলো তো, বেশ হলো। এখন চলো, হোটেলের দরজা ঠেঙাই গিয়ে। আমি বরং যাই আগে, তোমরা এসো।

মন চলে গেলো হোটেলে। এখন দরজা খোলা পেলে হয়।

যাক্ ! হোটেলের দরজা খোলা পাওয়া গেল। পাওয়া গেল ম্যানেজারের সহানুভূতি, ব্যাথায় ব্যথিত হলেন তিনি। বেশী কথা কি, গরম জলের ব্যাগের ব্যবস্থাও করে দিলেন একটা. অল্প কথায় দুরাবস্থার কথা জানিয়ে, বলে দিলাম খাওয়ার দরকার নেই। জামা কাপড় ছেড়ে লেপের তলায় যেতে পারলেই বাঁচতে পারি এ যাত্রায়। ম্যানেজার বুঝলেন আমার অবস্থাটা।

হট্ ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে লেপের তলায় হাত পা ছড়িয়ে যখন শুলাম, মনে হলো হাত পা গুলো শরীর থেকে খুলে খুলে পড়ে আছে বিছানায়, এমনিই দুর্বলতা।

চোখের পাতা কখন যে এক হয়ে এসেছিল জানিনে।

পরদিন সকালে যথারীতি চোখের পাতা খুললো বটে আমার, কিন্তু দেখি, নাক রয়েচে বন্ধ হয়ে সর্দিতে। মাথা ভার। সারা গা করচে ম্যাজ ম্যাজ। ভয় পেয়ে গেলাম। বিদেশ বিভূঁই জায়গা। অসুখ হলেই বিপদ। কে দেখবে ঠিক নেই। গত রাত্রে ভেজবার জের বেশ বোঝা গেল।

ঠিক করলাম, আজই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীতে গিয়ে টিকিট কিনতে হবে, যাতে কালই সকালে রওনা হতে পারি কলকাতায়। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দেখি সর্বাঙ্গে ব্যথা। মুস্কিল হ'লো। জ্বর-জারি না হয়।

এই শোন্ এদিকে। ঘরের দরজার সামনে দিয়ে বয়টা যাচ্ছিল, ডাকলাম তাকে। ঘরে এলো ছেলেটা :

ডাকচেন বাবু?

ক'টা বেজেচে রে?

ন'টা বাজে।

ন'টা! লেপটা কোমর পর্যন্ত নামিয়ে উঠে বসলাম। গরম জলের ব্যাগটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে বিছানার পাশে।

চা দেবো বাবু?

দে, দে খুব গরম এক কাপ চা। যেন মনে পড়ে গেল চায়ের কথা : আদা আছে রে? একটু আদা চা খাওয়াতে পারিস?

হ্যাঁ বাবু।

বয় চলে গেল। বসে রইলাম চুপ ক'রে। মনের মধ্যে নানা রাজ্যের চিন্তা এসে তোলপাড় শুরু করলো। কাল রওনা দেওয়াই ঠিক। বৃষ্টিতে ভেজা অন্যায় হয়ে গেচে। কিন্তু না ভিজে উপায় ছিল না। যদি মণিলালের বাড়ী থেকে আরো আগে বেরিয়ে আসতে পারতাম, তবে দুর্ভোগের হাত থেকে বাঁচা যেতো। কিন্তু মণিলালের বৌটা সত্যিই

অদ্ভুত, এড়িয়ে আসা শক্ত। ভালো কথা, মণিলালের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার, চলে যাবার আগে। না, না, ওর বাড়ীতে নয়। বরং ওর অফিসে দেখা করা যাবে। দেখা না করে গেলে অন্যায় হবে, মণিলাল কষ্ট পাবে। দেখি শরীরটা কেমন থাকে। ঐ পথে একেবারে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী থেকে টিকিটটাও কেটে রাখবো, কালকের। এ যাত্রায় হ্যাপি-ভ্যালি চেরাপুঞ্জি দেখা হ'লোনা দেখচি। আর এখানে আটকে গেলে মুস্কিল হবে, তা ছাড়া কলকাতায় অনেক কাজ পড়ে। উঠি দেখি—

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে আবার যখন ঘরে এলাম, দেখি বয়টা ডিশ্ চাপা দিয়ে কাপটা টেবিলের উপরে রেখে গেচে, আর একটা ডিশে টোষ্ট্! গরম টোষ্ট্ আর আদা-চা ভালোই লাগলো। শরীরটা খানিকটা সুস্থ হ'লো যেন, একটু হাল্কা মনে হ'লো। ঠিক করলাম, খানিকটা ঘুরে আসি, ঠিক হয়ে যাবে শরীর। বিছানায় শুয়ে থাকাটা ঠিক হবে না।

বেরুচ্চি, দরজার কাছে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা।

বললেন : আদা-চা করতে বলেছিলেন, শরীর খারাপ নাকি ?

বললাম : হ্যাঁ! কাল বৃষ্টিতে ভেজার জের। মাথাটা ভার, নাক বন্ধ সর্দিতে!

তবে বেরুচ্চেন যে!

শুয়ে থাকাটা ঠিক হবে না। একটু ঘুরে আসি! চা-টা খেয়ে এখন ভালোই লাগচে।

আসুন তবে। একটু সাবধানে থাকবেন। নতুন জায়গা।

সে তো বটে!

বলেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। কর্মব্যস্ত শিলংএর রাস্তায় নারী-

পুরুষের আনা-গোনা, ব্যস্ততা, ভীড়। তারই মাঝে মিলিয়ে গেলাম আমি, তাদেরই একজন হয়ে। বড়বাজারের কাছাকাছি এসেচি, এমন সময় দেখি প্রে-র মতো—হ্যাঁ তো, প্রে-ই আসচে সামনের পথ দিয়ে! ঘাঘরা ও ব্লাউজ পরা, মাথায় বড় একখানা কালো ওড়না, গলায় গিট বাঁধা। পায়ে ছিল উচু জুতো, হাতে নক্সা আঁকা সুতির ব্যাগ। সেদিন রাত্রে প্রে-কে সেবাপরায়ণা লজ্জাবতী নারীরূপেই দেখেছিলাম; আজ উজ্জ্বল দিনের আলোয় মনে হলো যেন কাঠোর কর্তব্যরতা দৃঢ়চেতা স্বাধীনা রমণী!

আমাকে দেখে চিনতে পারলো। হাসলো। দাঁড়ালো আমার সামনে: কুবলাই!

আমিও প্রতি নমস্কার জানালাম: কুবলাই!

কোথা যাচ্চেন? বেড়াতে?

হ্যাঁ! তুমি?

ডাংদারখানায়?

কেন? কার কি হ'লো?

প্রে-র হাসি মাখা মুখখানায় চিন্তার মেঘ নেমে এলো: লেড়কিটার বুখার হয়েচে!

তাই নাকি! জিগ্যেস করলাম: মণিলাল জানে না?

না! প্রে নরম গলায় বললো: উতো কাল আসে নাই! কাল রাতমে বুখার হোয়েচে!

মণিলাল কালকের রাত তার বাড়ীতেই কাটিয়েচে এবং আমার অনুরোধেই তাকে সেখানে থাকতে হয়েচে, সে কথাটা আর বললাম না। মেয়ের অসুখে মনে হলো যেন, প্রে বিপন্ন হয়ে পড়েচে; তবে স্বাধীন মেয়ে নিজেকে অসহায় বোধ করেনি, তা তার হাব ভাবে কথা-বার্তায় বেশ

বোঝা গেলো! তবু বললাম: বলো তো তোমার সঙ্গে যেতে পারি, ডাক্তারের কাছে। মনে পড়ে গেল নিজের শরীরের কথা: বললাম, কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে আমারও শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই। বরং চলো, আমারও একটা ওষুধ নেওয়া যাবে। হেসে বললাম: এখানে অসুখে পড়লেই তো বিপদ!

চলতে শুরু করলাম দুজনেই। প্রে বললো: এটা আপনার বিদেশ বোটে, তোবে কুছু হোলে বিপদে পড়বেন, ভাবচেন কেনো! আমরা তো আছি!

লজ্জা পেলাম: তা বটে! আমার ভুল হয়েচে।

তোবে হ্যাঁ! প্রে আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে মুখ টিপে হেসে বললো: বাড়ীতে যোতোটা যোত্নো হোতো, আরাম হোতো, তোতোটা তো হোবে না!

তাই বা কী ক'রে বলি, যতক্ষণ না পরখ করে দেখচি!

পরখ কি!—প্রে প্রশ্ন করে বসলো!

আচমকা প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়লাম: পরখ্, পরখ্—মানে, যাকে বলে সত্যি অসুখ করলে কেমন যত্ন করো, সেটা না বুঝলে কী ক'রে বুঝবো তোমার কাছে ভালো যত্ন পাবো না!

ওঃ, অনেক কষ্টে বোঝানো গেল। কথা প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিলাম: ডাক্তারবাবুর নাম কি?

এবার প্রে অপ্রস্তুত।

বললো: পুরা নাম আমি তো জানে না। ডাংদার সেন বলে জানে। আপনার বন্ধুর বন্ধু আছে! বাঙ্গালী। বড়া ভালো লোক। শিলংএ বহুত নাম।

জিগ্যেস করলাম : এখানে অনেক বাঙ্গালী আছে ? না ?

হ্যাঁ। প্রে বললো : যেত্না বড়া বড়া লোক, ভারি ভারি লোক সব বাংগালী আছে ! বাংগালী লোংকা বহুত মাথা আছে, না ?

হেসে ফেললাম : আর সকলের মাথা নেই ? কি আছে তবে ? মুণ্ডু ?

নেহি, নেহি ! প্রে বললো : মাথা আছে বোটে, তোবে তাতে গোবর আছে, ঘিউ নেই। বুঝলেন !···আসুন, এই যে ডাংদারখানা !

খেয়াল নেই, কথাবার্তায় কোন্ সময় পুলিশ বাজারে ডাক্তারখানার কাছাকাছি এসে পড়েচি। প্রে আমাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় ঢুকলো। সুসজ্জিত ডাক্তারখানা। কাঁচের আলমারিতে নানারকমের ওষুধপত্র সাজানো। চমৎকার ক'রে সাজানো। কলকাতার বাইরে এমন সাজানো ডাক্তারখানা দেখতে পাবো আশা করিনি। এক পাশে বেঞ্চিতে কয়েকজন রোগী অপেক্ষা করচে। ডাক্তার বাবুর বসবার জায়গা বলে যেটি মনে হলো, দেখলাম খালি। সত্যি হলো আমার অনুমান! প্রে খাসিয়া ভাষায় কম্পাউণ্ডারকে কি সব জিগ্যেস করবার পর আমাকে বললো : চলুন, একটু ঘুরে আসি। ডাংদারবাবু ক'লে গেচেন। আধঘণ্টা বাদে আসবেন !

তাই চলো। কিন্তু কোথায় ?

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রে বললো : এই ফাঁকে কঠো জিনিষ কিনে ফেলবো। যাবেন ?

বললাম : চলো। কী আর করবো ! যেটুকু বেড়ানো যায় ! কাল তো কলকাতার দিকে—

তাই নাকি ? প্রে যেন দুঃখিত হলো : এতো তাড়া কেনো। খুব কাজ আছে বুঝি ?

হ্যাঁ !

কিন্তু কুছু কি দেখা হোলো আপনার ? হ্যাপি-ভ্যালি, চেরা ?

কৈ আর হলো ?

তোবে ? আচ্ছা যদি খোকি ভালো থাকে বিকালে আপনাকে হ্যাপি-ভ্যালি দেখিয়ে আনবো। বাস যায়, কোনো অসুবিস্তা নাই। আর আপনার বন্ধু যায় তো আউর আচ্ছা !

আনন্দে বললাম ঃ এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। বলেই তাড়াতাড়ি কথাটার মানে বুঝিয়ে বললাম ঃ মানে খুব ভালো কথা। খুব রাজি ! মণিলালকে অফিসে বলবো !

আপনি যাবেন ওঁর অফিসে ?

হুঁ !

'কিন্তু' হয়ে বললো ঃ খবরটা দিবেন, খোঁকির বোথার !

নিশ্চয়ই ! আমি তো যাবোই। একবার দেখা করে আসবো, যাবার আগে !

বুদ্ধিমতী প্রে প্রশ্নবান ছাড়লো ঃ কেন ওঁর বাড়ী আপনার জানা নেই ?

নেই আবার ! মনে মনেই বললাম। মুখে বললাম ঃ হ্যাঁ, চিনি বাড়ী।

দেখা হোয়েচে গিন্নী-দিদির সঙ্গে ! আবার প্রশ্ন প্রে-র।

হ্যাঁ, হ'য়েচে !

এতক্ষণে বোধকরি খেয়াল হলো প্রে-র ঃ তা আপনি হোটেলেই আছেন ? বন্ধুর বাড়ীতে না ?

না ?

কেনো ?

মণিলাল থাকতে বলেছিলো, আমিই থাকিনি।

কেনো ?

প্রে-র 'কেনো' যেন আমাকে উত্যক্ত করে তুললো।

বললাম : এমনি। হোটেলে থাকলে যখন ইচ্ছা খেলাম ঘুমোলাম বেরুলাম—নিজের ইচ্ছেমত চলা যায়। অন্যের বাড়িতে থাকলে তাদের সুবিধে মত চলতে হয়। তাতে নিজেরও তো অসুবিধে হতে পারে!

তা ঠিক। যাক্ বুঝলো প্রে। তবু বললো : তবে গিন্নী-দিদির সঙ্গে দেখা না করে কলকাতায় যান তো গিন্নী-দিদি বহুৎ রাগ করবেন।

কেন ? তোমার গিন্নী-দিদি খুব রাগী নাকি ?

প্রে অপ্রস্তুতে পড়ে গেল : না, তা না। তোবে দেখা না করা ঠিক হোবে না।

আচমকা তাকে প্রশ্ন করে বসলাম : তুমি গিন্নী-দিদিকে দেখেচো ?

হ্যাঁ দেখেচি। প্রে সত্যি কথাই বললো কুণ্ঠিত হয়ে : আমি গিন্নী দিদির কাছে নোকরি করেচি।

তা ছাড়লে কেন ? জানিনে জানিনে করে নির্লজ্জের মতোই জিগ্যেস করলাম।

কিন্তু এড়িয়ে গেল প্রে। বললো : সে বহুৎ কোথা। আসেন এ দিকে ঐ যে দোকান।

বুঝলাম প্রে ও প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। দোকানে ঢুকতে যাবো এমন সময় কে যেন ডাক দিলো 'এ প্রে'। দুজনেই তাকিয়ে দেখি পাশের চায়ের দোকান থেকে একটি তরুণী খাসিয়ানী প্রে-কে ডাকচে। প্রে খুসী হয়ে এগিয়ে গেল তার কাছে। ডাকলো আমাকেও। পরিচয় করিয়ে দিল : এ কা ক্রীম আছে। আমাকে দেখিয়ে বললো : এ বাবু

কলকাতা থেকে শিলং আসিছেন। বলেই খাসিয়া ভাষায় আরো কী সব বলে আমাকে বললো : ক্রীম আপনাকে চা খেতে বোলচে, খাবেন ?

বললাম : তোমার বন্ধু বলচে যখন, খাওয়া যাক্।

ছোট্ট একটা কাঁচা ঘর। তার খানিকটা পর্দা দিয়ে আড়াল করা সামনে একটা টেবিল পাতা, তাতে গেলাস, কাপ ডিস সাজানো। সামনে বাইরের পাতা একটা বেঞ্চিতে বসে এক খাসিয়া যুবক। বোধ হয় খদ্দের। পাশে তোলা উনুনে কেটলি বসানো জল গরম হচ্চে।

প্রে আমাকে নিয়ে গেল দোকানের ভিতরে, বসালো পর্দা ঘেরা একখানা ছোট টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে। বললো : বসুন, ক্রীমকে ভালো দুকাপ চা করতে বলি ! আর দুটা টোষ্ট ! আর আমলেট।

না, না ! বাধা দিলাম : আমলেট, টোষ্ট, কিচ্ছু না। বরং শুধু চা ! তুমি বরং নাও। পরে ভাবলাম, আমি না খেলে প্রেও হয়তো খাবে না ; আর না হয় পয়সা আমিই দিয়ে দেব, কাজেই বললাম : আচ্ছা, দু'খানা ক'রে টোষ্ট দিতে বলো, আমারটায় একটু গোলমরিচ আর নুন !

ঠিক আছে ! বলেই প্রে বেরিয়ে গেল পর্দার বাইরে। টেবিলের উপরে একখানা পুরোন ছেঁড়া গোছের ইংরেজি ছবির পত্রিকা প'ড়েছিল। অন্যমনস্কভাবেই দু'চার পাতা ওল্টাতেই দেখি সেখানা নানা ভঙ্গীতে বিদেশিনীদের নগ্নচিত্রে ভরা। তাড়াতাড়ি পত্রিকাখানা মুড়ে রাখলাম, যেন দেখিনি। হঠাৎ কানে এলো, চায়ের দোকানের টিনের চালের উপর চড়বড় শব্দ ! বৃষ্টি শুরু হলো। কতক্ষণ চলবে কে জানে ! বৃষ্টিকে থোড়াই কেয়ার করে বেরিয়ে পড়বো, সে সাহসও নেই ! কাল একবার ভিজেচি, আজ আবার ভিজলে আর রক্ষে নেই। তবে লাভ হলো একটা

জিনিষ। দেখলাম শিলংএর বৃষ্টি। দিনের মেঘলা আলোয় অপরূপ হয়ে উঠেচে অঝোর ধারা। ঝাপসা পাইন গাছগুলো দাঁড়িয়ে তাদের পাতার ঝাকড়া চুল নাড়াচ্চে আপন মনে। পাশের ছোট জানালা দিয়ে জলের ছিটে আসছিল একটু একটু। আসুক। পাহাড়ে বৃষ্টির দামাল রূপ দেখতে গেলে ভয় করা চলে না। বেপরোয়া হতে হয়!

পিচের পথটা ধুয়ে চকচকে পালিশ হয়ে গেল। সে পথে দু'চারটে লোক চলচে বটে, কেউবা ভিজে একসা, কারোর মাথায় পাতায় বোনা ঢাকা, আর তারা বেশির ভাগই খাসিয়ানী তরুণী। কালো পিচের ভিজে পথে সুবর্ণা খাসিয়ানীদের সচল নিটোল পা—আহা যেন কালো দীঘির জলে তরঙ্গ চঞ্চল শ্বেতপদ্ম। দূরে ছবির মতো রঙীন সুন্দর কাঠের বাড়ীগুলো এখানে ওখানে দিব্যি বৃষ্টিতে ভিজচে মজা করে। একটু পরেই শুরু হলো জল আছড়ে পড়ার ঝমঝমানি শব্দ! নর্দমার ভরা জল আছড়ে গিয়ে পড়চে আর এক নর্দমায়। এমনিতর কত ঝর্ণাই না সৃষ্টি হয় সারা সহরটায়। মন বলছিল ছুটে যাই বেরিয়ে। পথে পথে ছুটে বেড়াই বৃষ্টি মাথায় করে। ওদের সঙ্গে মিশে যাই, এক হয়ে যাই। যাবে? যাও। মন ছুটে গেল পাইন ঘেরা ভেজা পথে, শুরু করলো ছুটো ছুটী। বৃষ্টি গেল ক'মে।

হঠাৎ কানে এল প্রে আর ক্রীমের কথা। অবোধ্য, তবে এইটুকু বোধগম্য হলো যে, কথাগুলি ধারালো, কণ্ঠস্বরে রোষের রেশ। মনকে নিয়ে এলাম টেনে, বললামঃ এদিকে আয়, শোন মন দিয়ে, কী বলচে ওরা।

বসে বসে শুনতে লাগলাম, পর্দার বাইরে দুই খাসিয়া তরুণীর দুর্বোধ্য ভাষায় কথা। হঠাৎ যেন মনে হলো প্রে-র গলা আরো চড়া। ব্যাপার

কী ? একটু যেন গোলমেলে মনে হচ্চে ! আরো কিছু ভাববার আগেই প্রে পর্দার ভিতরে গলা বাড়িয়ে আমাকে বিশুদ্ধ হিন্দীতে ডাকলো ঃ

আইয়ে আপ্, বাহার আইয়ে, চলিয়ে।

কী হলো ? মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেরিয়ে এলাম পর্দার বাইরে। দেখলাম প্রে-র মুখ চোখ লাল, রাগে। কিন্তু ক্রীম হাসচে মুচকে মুচকে। হাসচে তার যুবক খদ্দেরটাও।

প্রে খাসিয়া ভাষায় ক্রীমকে কি একটা কথা—বোধ হয় গালাগালি দিয়ে আমাকে শুধু বললো ঃ আইয়ে।

বেরিয়ে পড়লাম প্রের পেছন পেছন দোকান থেকে ! কানে এলো বিদ্রূপের শিস্—যুবকের কীর্তি। ক্রীমের নিষ্ঠুর হাসিও শুনতে পেলাম।

সঠিক কি হলো বুঝলাম না। তবে ব্যাপার যে কী, তা আন্দাজ করতে কষ্ট হলো না কিছু। বুঝলাম, ব্যাপারটা আমাকে নিয়েই, আমাকে উপলক্ষ্য করেই ! প্রে-র সঙ্গে আমার মতো এক বাঙ্গালী বাবুকে দেখে ওরা কিছু ভেবে নিয়ে, ওকে ঠাট্টা করে কিছু বলেচে, তাই প্রের রাগ।

প্রে কোনো কথা বললো না। মাথা নীচু করে চললো। বুঝলাম, ওর রাগ, লজ্জায় এসে ঠেকেচে। লজ্জায় যেন আমিও সংকুচিত হলাম। আমারই জন্যে প্রে তার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করলো। ঠিক হয়নি, প্রে-র সঙ্গে আমার চায়ের দোকানে যাওয়া। খারাপ কিছু ভাবা, হয়তো ওদের অন্যায় হয়নি। খেয়াল হলো, পথ দিয়ে এসেচি প্রে-র সঙ্গে—আরও অনেকে হয়তো অনেক কিছু ভেবেচে। তা ছাড়া, মণিলাল, মণিলালও তো কিছু ভাবতে পারে ? সব ভাবনা জড়ো হলো আমার মাথায় ! আর না। এখানেই ইতি করা হোক ! প্রে-কে বর্জন করতে পারলেই যেন স্বস্তি পাই মনে হলো। কেবলি মনে হতে লাগলো, আশে পাশের সবাই যেন

আমাদের ছ'জনকে গিলচে।

একটা গলির মুখে একটু নির্জন জায়গা পেয়ে দাঁড়ালাম সেখানে। দাঁড় করালাম প্রে-কে পাইনের ছায়ায়, জলো ভাব তখনও সেখানে।

প্রে।

প্রে আমার দিকে মুখ তুলে চাইলো।

আমি যাই।

আমার অন্যায় হোয়েচে ক্ষমা মাংচি।

তোমার কোনো অন্যায় হয় নি প্রে।

ও খারাপ কথা বললো। আমি বকে দিলাম তাই। মাথা নীচু করে বললো প্রে।

আমি তা বুঝতে পেরেচি।

আপনার ছা খাওয়াও হোল না।

চা আমার দরকার ছিল না। আচ্ছা আমি যাই। মণিলালের সঙ্গে দেখা করিগে।

আপনি এই সব কোথা ওঁকে বলবেন ?

তুমি কি বলো ?

আমি কুছু বলতে পারচিনে, ভাবতে পারচিনে! এমোন হোবে, আমি একদম ভাবিনি। আপনি আমার একটা কোথা রাখবেন ?

বলো!

আপনার বন্ধুর সঙ্গে এসে আজ বিকেলে আমাদের ওখানে ছা খাবেন ?

প্রে-র সংকোচ ভরা প্রশ্নের উত্তর আমিও অসংকোচে দিতে পারলাম না। একটু ভাবতে হ'লো। ভেবে বললাম : আচ্ছা, দেখবো চেষ্টা করে, যদি সময় পাই।

প্রে আমার মুখের দিকে করুণ নয়নে চেয়ে শুধু বললো : আমার খুব মিনতি থাকলো আপনার কাছে।

আর দাঁড়ালোনা সেখানে। হয়তো লজ্জার হাত থেকে এড়াবার জন্যে, হয়তো বা চোখের জল সামলাবার জন্যেই প্রে প্রায় দৌড়ে সরে গেল আমার কাছ থেকে। ডাক্তারখানার দিকেই এগিয়ে গেলো দেখলাম।

আমিও আমার ভাঙা মনটা জড়ো করে জুড়ে নিয়ে পা চালালাম। মণিলালের সঙ্গে তার অফিসে দেখা করে হোটেলে ফিরবো।

পথে লোককে জিগ্যেস ক'রে ক'রে এসে পৌঁছুলাম তার অফিসে। বেলা দশটা বেজে গেচে। শুরু হয়ে গেচে অফিসের কাজ। সামনেই অফিসের এক বেয়ারাকে পেলাম। জিগ্যেস করে জানলাম, মণিলাল এসেচে অফিসে। তাকে বললাম, আমি মিঃ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বেয়ারা কথায় সিলেট টান দিয়ে বললো : আপনি বসবার ঘরে আসুন। শ্লিপ দিন, সাহেবকে দিতে হবে।

বেয়ারার পেছন পেছন যেতে যেতে বললাম : সাহেবের সঙ্গে এখুনি দেখা হবে তো? আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

বেয়ারা ঘাড় ঘুরিয়ে বললো : তা বলতে পারচিনে। আরো দু'জন বাবু, একজন মাড়োয়ারী শ্লিপ পাঠিয়ে বসে আছেন। সাহেবের ঘরেও একজন বাইরের সাহেব কথা বলচেন।

তবেই তো মুস্কিল। আচ্ছা চলো। শ্লিপ তো দাও।

মনে মনে দমে গেলাম।

বসবার ঘরে গিয়ে দেখি, বেয়ারার কথা রীতিমত সত্যি। একখানা গোল টেবিলের চারধারে চেয়ার সাজানো। তারই তিনখানা চেয়ার দখল করে তিন ভদ্রলোক—টেবিলে রাখা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্চেন অলস হাতে।

আমি শ্লিপ প্যাডে আমার নাম লিখে, পাতাখানা ছিঁড়ে বেয়ারার হাতে দিয়ে, একখানা চেয়ার টেনে বসলাম। বেয়ারা চলে গেল শ্লিপ দিতে।

টেবিল থেকে আমিও একখানা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবেই মাত্র দু'চার পাতা উল্টেচি, এমন সময় বেয়ারা আমার কাছে ফিরে এসে বললো : আসেন আপনি।

আমি ? অবাক হ'লাম। শুধু আমি অবাক হলাম না, যাঁরা আগে থেকে বসে ছিলেন, তাঁরাও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন আমিও একবার তাদের উপর চোখ বুলিয়ে বেয়ারাকে বললাম :

ঠিক শুনেচো তো ?

হ্যাঁ, আপনি আসেন।

অতএব চেয়ার ছেড়ে উঠতেই হলো। তারপর, আর তিনজন অপেক্ষা-মান ভদ্রলোককে ভাবিয়ে দিয়ে, অবাক করে দিয়ে, আমি পিছু নিলাম বেয়ারার। বারান্দা ও ঘর পার ক'রে আমাকে যে ঘরে নিয়ে গেল, তার দরজায় দেখলাম পেতলের নেমপ্লেট আঁটা : মিঃ এম্, এল, মুখার্জি, ডিভিসনাল ইনস্পেক্টর।

আমি ঘরে ঢুকতেই মণিলাল ইশারায় আমাকে তার ডান দিকের চেয়ারটায় বসতে বললো। সামনের চেয়ারে এক খাসিয়া সাহেব। তার সঙ্গে খাসিয়া ভাষায় অনর্গল কি বলচে, আর সাহেব ঘাড় নাড়চে।

আমি মণিলালের দিকে চেয়ে থাকলাম। দিব্যি ফিট্‌ফাট্‌ সাহেবি পোষাকে সজ্জিত মণিলাল কেমন অভ্যস্ত গাম্ভীর্যে নিজের বক্তব্য বলচে। এই কি রাতের মণিলাল ? গত রাতের মণিলাল, প্রভার স্বামী ? তার আগের রাতের মণিলাল, প্রে-র প্রণয়ী ? এই কি মাতাল মণিলাল ? চোখের সামনে অফিসে কর্ত্তব্যরত মণিলালকে দেখে মনে হলো, সেগুলো সব মণিলালের প্রেতাত্মা। আসল মানুষটি বুঝি ঐখানেই, চোখের সামনে। গম্ভীর, কঠোর কর্তব্যপরায়ণ ! না কি মণিলাল অভিনেতা ! কর্ম-রঙ্গমঞ্চে এখন সে অভিনয় করচে তার অংশটুকু। শেষ হলেই বেশ ফেলবে বদলে, চলবে অন্য খেল্‌। যাত্রা দলের রাজা চোখ ঝলসানো পোষাকে আসর মাত করে এসে, শেষে সাজ খুলে সাজঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফোঁকে যেমন, তেমনি বুঝি মণিলালের জীবন।

হঠাৎ খাসিয়া সাহেব উঠে দাঁড়াতেই বুঝলাম, সাহেব এবার যাবে। সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে অল্প দু-চারটে কথা বলবার পর, মাথা হেঁট করে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মণিলালের মুখে হাসি। গাম্ভীর্যের মুখোসটা খুলে ফেলতেই হাল্কা হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার মুখে। বললো ঃ

কী খবর হঠাৎ ?

এলাম দেখা করতে।

তা অপিসে যে ?

সত্যি, অফিসে আসা বোধ হয় ঠিক হলো না। বললাম ঃ তোমার অনেক কাজ। দু'তিন জন ভদ্রলোক বসে আছেন তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। অথচ আমাকে ডাকালে আগে।

আরে থামো। মণিলাল বললো ঃ ওরা এসেচে নিজের স্বার্থে। বসুক

না খানিকটা। তা আমাকে দেখবার জন্যে হঠাৎ তোমার মন এমন উতলা হয়ে গেল যে ?

কাল কলকাতায় যাবো ঠিক করেচি।

সে কি হে ? না, না। মণিলাল আপত্তি করলো : এই তো মাত্র কয়েকদিন এলে, কিছুই তো দেখলে না।

হাসলাম আমি : এত দেখালে, তবু বলচো দেখলাম না।

চোখ টিপে হাসলো মণিলাল : বটে ! এতেই দেখবার শেষ হলো ? ব্রাদার, এ সংসারে অনেক কিছু দেখবার আছে ; দেখার শেষ নেই দাদা, দেখার শেষ নেই !......না, না, দু'চার দিন আরো থেকে যাও। আমি বোধহয় কাল বা পরশু চেরা-য় যাবো, তোমায় নিয়ে যাবো সঙ্গে।

বললাল : লোভ দেখিয়ো না মণিলাল, সংকল্পচ্যুত হতে হবে শেষকালে।......হ্যাঁ, ভালো কথা, প্রে-র সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ডাক্তার খানায় যাচ্ছিল সে। তোমার মেয়ের নাকি অসুখ।

তাই নাকি ? মণিলালের মুখে চোখে পিতৃত্বের উৎকণ্ঠা দেখা দিল।

বললাম : ভাববার কিছু নেই। মনে হয় সর্দিজ্বর। যা করবার দরকার, প্রে কি পারবে না ?

তা পারবে ; মণিলাল হাসলো এবার : এ দেশী মেয়ের সঙ্গে ঘর করে ঐ টুকুই যা সুখ। সুখে সংসার করা যায়, ভাবতে হয় না কিছু। খাও, দাও, ঘুমোও কিম্বা যাও আড্ডা মারতে, এসে দেখবে এভ্রিথিং রেডি। আমাদের দেশে পুরুষে রক্ষিতা রাখে এখানে মেয়েরাই রেখেচে পুরুষকে, এমন বহুত পাবে। তারা পুরুষকে সেবা করে, যত্ন করে, গালাগালি করে, আবার গালাগালিও খায়ও, এমনকি লাথিও খায়—কিন্তু সময় মত খাওয়াতে ভোলে না। বড় ভাল মেয়েমানুষ গো এ দেশের। বললাম :

চেখে যাও।

বুঝলাম, মণিলালের ভিতরকার অশ্লীল পশুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করচে। বললাম: শোনো, আমি চলি তুমি কাজ করো। আমি গিয়ে চিঠি দেবো, তুমি উত্তর দিও।

কী বলচো যা-তা! মণিলাল বিরক্ত।

কলকাতায় কাজ আছে যে! দুর্বল আপত্তি জানালাম।

আচ্ছা বেশ, বিকেলে তোমার হোটেলে যাবো, সেখানে তোমার কাজের লিষ্টি শুনে, ছুটি দেওয়া যাবে'খন।

দেখলাম, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বললাম: তাই যেয়ো। থাকবো।

বেরিয়ে এলাম মণিলালের আফিস থেকে।

মণিলাল বিকেলে যখন হোটেলে এল, আমি তখন লেপের তলায় জ্বরে ধুঁকচি। মাথা টিপ টিপ করচে, অসহ্য যন্ত্রনা। গা-হাত-পা কোমর কন কন করচে, ছিড়ে পড়চে। জ্বর কত জানিনে, তবে থার্মোমিটারের পারা যতটা উঠতে পারে হয়তো উঠে আছে। আর না উঠলেও, বুঝতে হবে, নেহাৎ অচেনা জায়গা বলেই আমাকে খাতির করেচে। হোটেলের বয়টা কোন সময় মাথায় জল-পটি দিয়ে গেচে, হয়তো ম্যানেজারের নির্দেশ মত।

চোখ বুজেই পড়েছিলাম, কপালে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ খুলে দেখি মণিলাল দাঁড়িয়ে; পাশে হোটেলের ম্যানেজার। মণিলালের মুখে হাসি, মুখ শুকনো ম্যানেজারের।

কী গো, বাঁধা-ছাঁদা রেডি? মণিলাল বললো।

কোঁকিয়ে বললাম: আর ভাই!

তুমি নিজেই তো একটা লেপের বাণ্ডিল হয়ে পড়ে আছ দেখচি। এবার কলকাতায় 'বুক' করে দিলেই হয়।

বললাম : যা হয় করো। Man proposes God disposes.

আর, এ ক্ষেত্রে মণিলাল opposes. যাক্, ম্যানেজার বাবুর কাছে শুনলাম, বৃষ্টিতে ভিজেচো কাল রাত্রে। আমার বাড়ী থেকে আসবার পথে বুঝি ?

হ্যাঁ।

অতএব দেখো, আমারই জন্যে তোমার এই দুর্ভোগ ; এখন আমাকেই আমার ইচ্ছেমত ব্যবস্থা করতে হবে, কী বলুন ম্যানেজার মশায় ?

নিশ্চয়ই ! ম্যানেজার ভাবতে পারেননি এত সহজে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে : আপনি যখন ওঁর বন্ধু এখানে আছেন—তখন—

বন্ধু ? বন্ধু হলে কখনো এ সময়ে ঘাড় পাতি ? মণিলাল রসিকতা করলো : পড়েন নি, সুসময়ে বন্ধু বটে সকলেই হয় ? এটা কি ওর সুসময় ? আচ্ছা, আপনি যান, কাজ করুনগে। বোর্ডারদের বিকেলের চা-পানির ব্যবস্থা করতে হবে তো এখন ?

হ্যাঁ। আচ্ছা আসি। ব'লে মুক্তি পাওয়া ম্যানেজার ঘর থেকে এক রকম ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলেন।

মণিলাল আমার পাশে বিছানার উপর একটু জায়গা করে নিয়ে বসলো। মাথাটা টিপে দিতে দিতে কাণের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললো : কী ভালো লাগচে ?

হ্যাঁ।

সেকি ! এই শক্ত কড়া-পড়া হাতের মাথা-টেপা বরদাস্ত করতে পারে পুরুষে ? মাথা তো আরও ধরে যায়।

ম্লান হাসি হাসলাম ঃ নরম হাত পাবো কোথায় বলো ?

কী যে বলো ! মণিলাল বললো ঃ আমারই তো দুজোড়া নরম হাত আছে, পোষাকি আর আটপৌরে। তা ছাড়া নরম হাত ভাড়াও পাওয়া যায়।

ইয়ার্কি রাখো। জিগ্যেস করলাম ঃ তোমার মেয়ে কেমন আছে, খবর নিয়েচো ?

হ্যাঁ। প্রে তার সব ব্যবস্থা করেচে।

বাড়ী যাওনি ?

কোন বাড়ী ?

তোমার নিজের বাড়ী।

আমার তো দুটোই নিজের বাড়ী। তুমি এক নম্বরের কথা বলচো ?

হ্যাঁ।

হুঁ, সেখানেও হাজরে দিয়েচি। ধড়া চূড়া খুলে, বরাদ্দের চা-খাবার খেয়ে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। এসে দেখি, পপাত বিছানা 'পরে। এখন কোথায় যাবে চলো। এক নম্বরে না দু-নম্বরে ?

কোনো নম্বরেই না। এই ষোলো নম্বর ঘরেই থাকবো।

মাপ করতে হলো রাজা। মণিলাল বললো ঃ আমার জন্যেই তোমার এই অসুখ, অসুখ সারাতেও হবে আমাকেই। এক নম্বরেই পাঠাতাম, কিন্তু সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্চেন অবলা বঙ্গ-রমণী ; বিপাকে পড়লে হায় হায় করতে থাকবেন শুধু, কোনো উপায় করতে পারবেন না। অথচ কাল অফিসের কাজে যাচ্চি চেরায় ! আমাদের অফিসের বেয়ারাকে বলেচি রোজ এক নম্বরে বাজার করে দিয়ে আসবে, আর সন্ধ্যের মুখে খবর নিয়ে আসবে, কিছু লাগবে কি না। অতএব একমাত্র ভরসা আমার

দু-নম্বর। ডাক্তার ডাকা, পথ্যির ব্যবস্থা করা, সেবা যত্ন করা সব প্রে করবে পাকা প্রেমিকের মতো। তারপর চোখ টিপে বললো ঃ বুঝলে, ওর হাত খানা সত্যিই নরম, তোমার মাথা টিপতে দিয়ে এক ফাঁকে টিপে দেখো।

কী যা তা বলচো? আপত্তি করলাম।

কেন গল্প করিনি, ওর হাত টিপে দেখেই তো ওকে ঘরে এনেচি!

কিন্তু তুমি চলে যাবে বাইরে, আমি একলা থাকবো, সে কেমন হবে!

ভয় হচ্চে? মণিলাল হাসলো ঃ নিজের উপর বিশ্বাস নেই বুঝি? অথচ আমি বিশ্বাস করচি তোমাকে, কী আশ্চর্য!

না, না, তা নয়। বাধা দিলাম ঃ ওদের অসুবিধে হবে তো!

অসুবিধে মানে? ওরা কী সুখের পায়রা, যে, অসুখের ভয়ে পালাবে! প্রে আছে, কং আছে, কোন অসুবিধে হবেনা। আর আমিও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে চেরা-য় যেতে পারবো।

কিন্তু লোকে তো কিছু ভাবতে পারে।

ভাববে মানে? মণিলাল আমার আপত্তি খণ্ডন করলো ঃ আমার নিজের লোক, আমার নিজের মেয়েমানুষের ঘরে আছে, আমার ব্যবস্থামত —এতে কার কি আপত্তি করবার থাকতে পারে? আমার ঘোড়ায় আমি যদি কাউকে চড়তে দিই, তাতে অন্যে দেখে হিংসেয় জ্বলতে পারে, আপত্তি করতে পারে না। তুমি ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও। বেশি বোকো না, শরীর খারাপ; আমাকেও বকিয়োনা, মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে, ঠিক করতে শেষে মাত্রা বাড়াতে বলো নাকি?

মণিলাল একটানা বলতে লাগলো ঃ তোমার দামী জিনিষ, মানে টাকা পয়সা কোথায়? সে সব এক নম্বরের জিম্বায় রেখে দিতে হবে।

ছ'নম্বরে কং-এর আবার হাতটান আছে। অবশ্য তোমার চিকিৎসা খরচ আমি ওর কাছে রেখে যাবো, ভেবোনা।

ভাবতে আর দিচ্চো কৈ! বললাম।

যাক ভবিষ্যতের ভাবনা গেলো, এবার বর্তমানের। ব'লেই মণিলাল হাঁক দিলো: বয়, এই বয়।

হাঁক শুনে ছুটে এলো ছোকরা।

মণিলাল বললো: ম্যানেজারকে বল্, ডাক্তার নৃপেন দত্তের বাড়ীতে ফোন করতে। তিনি যেন তাঁর চেম্বারে যাবার আগে এখানে হয়ে যান! বলবি ইলেকট্রিকের মণিলাল মুখুজ্জে আপনার জন্যে হোটেলে অপেক্ষা করচেন। পারবি তো বলতে?

হ্যাঁ, বলেই বয় বেরিয়ে গেল।

মণিলাল বললো: কৈ তোমার মণিব্যাগ কোথায়? কত মালঝাল আছে?

বেশি না। শ'খানেক টাকা হবে। বললাম: ভাই এক কাজ করো। If you don't mind, আমার চিকিৎসার খরচ ঐ থেকেই করো। যদি অল্পের উপর দিয়ে হয়, ভালোই; নইলে তুমি তো আছোই মহাজন। এই নাও, বালিশের তলায় ব্যাগ।

আমি ঘাড়টা একটু ওঠাতেই, মণিলাল বালিশের তলা থেকে মণিব্যাগ বার করলো। বললো: বুঝেচি, ভেবেচো, টাকার টানাটানি হবে আমার। দেখো ব্রাদার, ঘুষ নিইনে বটে, তবে যা পাই, তোমাদের পাঁচজনের বাপ মায়ের আশীর্বাদে, ছটোসংসার, ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে এখনও তো বোতল-কার্তিক হয়ে আছি, পরে কি হবে জানিনে। লাইফ ইন্‌সিওরও করেচি। আমি আমার ডিউটি করে যাবো, যাতে কোনো

শালা না কিছু বলতে পারে। যাক্, তুমি যখন বলচো, তোমাকে আর কিন্তুর মধ্যে ফেলবো না; পঞ্চাশ টাকা রেখে দেবো প্রে-র কাছে, আমিও কিছু রেখে যাবো, যদি দরকার লাগে—আর তোমার বাকি রেস্ত ব্যাগ সমেত থাকবে এক নম্বরে, তোমার যাওয়ার খরচ।

বললাম ঃ তথাস্তু!

এমন সময় ম্যানেজার এলেন ঘরে।

মণিলালকে বললেন ঃ ডাক্তার দত্ত এখুনি আসচেন, আপনাকে থাকতে বললেন।

ঠিক আছে। আমি আছি। মণিলাল বললো।

ম্যানেজার চলে গেলেন। একটু পরেই এলেন ডাক্তার নৃপেন দত্ত! স্যুট্ পরা, স্মার্ট ভদ্রলোক, হাতে ষ্টেথিসকোপ। মণিলালের কাছে ব্যাপারটা সংক্ষেপে জেনে নিয়ে আমার বুক পিঠ ইত্যাদি পরীক্ষা করে যে রায় দিলেন, তাতে জানলাম, বুকে সর্দি জমেচে, M. B. 693 র ব্যবস্থা করতে হবে, আর চাই সম্পূর্ণ বিশ্রাম। অর্থাৎ শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকতে হবে দু'চার দিন। সেবা যত্নের অসুবিধের জন্যে হোটেল থেকে আমাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া এ অবস্থায় ক্ষতিকর হবে কিনা—মণিলাল জিগ্যেস করায় অনুমতি পেলো। দেখলাম, মণিলালের মুখে নিশ্চিন্তের ভাব ফুটে উঠেচে।

ডাক্তার দত্ত প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেলেন।

মণিলাল ডাকলো ম্যানেজারকে। ম্যানেজার আসতেই মণিলাল কাঠখোট্টার মতো জিগ্যেস করলো ঃ আপনার যতো পাওনা আজ পর্যন্ত, বিল করে আনুন, মিটিয়ে দিই। গাড়ির ব্যবস্থাও করুন, ওর সদ্গতি না হ'লে শেষে আপনার ঘাড়ে চাপবে।

রোগ যন্ত্রণার মধ্যেওহাসলাম : তা তোমার ঘাড়েই তো ভর করচি।

তা করো, কোন আপত্তি নেই। মণিলাল বললো : আমার ঘাড় রীতিমত শক্ত। দু'টীকে দু'ঘাড়ে চাপিয়ে ধেই ধেই করে নাচছি, তোমাকে না হয় মাথায় করে নিয়ে নাচবো। নাও, নাও, be ready.

ম্যানেজারকে বললো : কৈ, ডাকুন গাড়ি, আনুন বিল।

মণিলাল নিজের মনিব্যাগ থেকেই একুশ টাকা দশ আনা বা'র করে বিল চুকিয়ে দিয়ে, ম্যানেজারের কবল থেকে আমাকে হস্তগত করলো। আমার ঋণ চুকিয়ে, আমাকে ঋণী করে রাখলো। আমাকে যেন কিনে নিলো হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে। পরে নিজের ইচ্ছেমত, খেয়ালমত তার কেনা জিনিষটাকে বগলদাবায় করে গিয়ে উঠলো তার প্রেমিকা প্রে-র আস্তানায়—যেখানে তার জোর আছে, যেখানে সে অলঙ্ঘনীয় হুকুমের হাকিম, একচ্ছত্র অধিপতি।

আপত্তি ক'রে লাভ নেই। মণিলাল বন্ধুর কর্তব্য করচে। যা করচে সে, আমারই ভালোর জন্যে। বিদেশে এই বিপদের দিনে যে উপকার করতে এসেচে এগিয়ে, তাকে বাধা দিয়ে বিপদ বাড়ানো মূর্খতা। অগত্যা তার ইচ্ছার সঙ্গেই আমার ইচ্ছাকে—যথা ইচ্ছা, যা ইচ্ছা, করতে দিয়ে আমি নির্লিপ্ত হয়ে রইলাম। ফল খারাপ হল কৈ ? প্রে-র সযত্নে পাতা নরম বিছানার 'পরে দুর্বল, অস্বস্তিকর দেহটাকে পরম আরামে এলিয়ে দিলাম। চোখ বুজে শুনতে লাগলাম, মণিলালের কথা ; থাসিয়া ভাষায় প্রে-কে বুঝিয়ে দিচ্চে, কখন কি করতে হবে।

তোমার যখন যা দরকার, প্রে-কে বলবে, কংকে বলবে, লজ্জা

করোনা। মণিলাল আমাকে বোঝালো : লজ্জা করলে তুমিই ঠকবে। যাক্, ভালোই হলো, তোমাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেওয়া গেল। বাবা, মণিলাল মুখুজ্জে কচি ছেলে নয়, বিনে স্বার্থে সে এক পাও নড়ে না।

তার মানে ? আমার অবাক প্রশ্ন মণিলালকে হাসালো।

মানে যদি বুঝতে, তাহলে কি আসতে বাপধন এখানে ?

বললাম : খুলে বলো মণিলাল !

হ্যাঁ, এখন বলতে বাধা নেই। তোমাকে এখানে রেখে গেলাম, আমার দু নম্বরের এই বাড়ী-ঘর মাল পত্র পাহারা দিতে। আমার আসল মালটীকেও পাহারা দিয়ো ; তবে ভক্ষক হয়ে বসো না, বুঝলে ?

বলেই মণিলাল অসভ্যের মত হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—পাছে আমার কাছে বকুনি খেতে হয়।

লজ্জায় লাল প্রে আমার গায়ে লেপটা ভাল করে চাপিয়ে দিয়ে বললো : ছা খাবেন ?

বললাম : বিকেলে চায়ের নেমন্তন্নই তো করেছিলে। দেখলে তো, ঠিক এসেচি মণিলালের ঘাড়ে চেপে। দাও চা, একটু পাতলা করে দিও।

প্রে বললো : আপনি এমোন ভাবে আসবেন, বুঝা যায়নি। বোড়ো কোষ্টো হবে এখানে।

কষ্ট তোমদের হবে, আমার নয়। বললাম : মণিলাল আসবে তো আবার ? বলে গেল কিছু ?

বলেনি। ওঁর ইচ্ছা। আমি ছা আনি।

প্রে চলে গেল পাশের ঘরে। যাবার সময় সন্ধ্যার প্রায় অন্ধকার ঘরে আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। চুপ করে শুয়ে রইলাম আমি। গায়ে

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। তবু নিশ্চিন্ত। সেবা যত্নের ত্রুটী হবেনা; হবেনা ওষুধ-পথ্যের অব্যবস্থা—নিশ্চিন্ত হবার কম কারণ নয়।

একটু পরেই প্রে এলো চা নিয়ে বললো: খান।

উঠে বসে এক চুমুক চা খেয়ে জিগ্যেস করলাম: তোমার মেয়ে কোথায়? কং?

কং সতীকে কোলে নিয়ে বসে আছে। উ ঘরে।

কেমন আছে সতী?

ভালো আছে। জ্বর নাই।

আবার এক রোগী ভর্তি হল। ভালো কথা, আমার ওষুধটা আনার ব্যবস্থা কি হলো, জানো?

সেটা আপনার বন্ধুর ব্যবস্থা, বলে গেচে।

চা খেয়ে খালি কাপ ডিশ প্রের হাতে তুলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

প্রে জিগ্যেস করলো: আর কিছু দোরকার হোবে?

না।

এখন কেমোন লাগচে?

গা হাত পায়ে বেদনা, মাথায় যন্ত্রনা। এগুলো না থাকলে একট ঘুমিয়ে বাঁচতাম।

প্রে বললো: বোলেন তো পা-টা টিপে দিতে পারি।

না, না। তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম: ওসব কিছু দরকার নেই। দেখো তো, পায়ের দিকে লেপ উঠে গেছে কিনা। ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকচে। আর আলোটা নিভিয়ে দাও, একটু ঘুমুবার চেষ্টা করি!

প্রে আমার পায়ের দিকে লেপটা ভালো করে গুঁজে দিয়ে, ঘরের স্থইচটা নিভিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে।

ঘরে আলো নেই দেখেই বোধ করি বাইরের ষ্ট্রীট্ লাইটের এক ঝলক আলো জানালার কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়ে এসে, মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো।

আমি চোখ বুজলাম।

ঘুম ভাঙলো মণিলালের গলার শব্দে। জড়ানো কথা, টানা টানা কথা। বুঝলাম মণিলাল মদ খেয়ে এসেচে। আমার এঘর অন্ধকারই রয়েচে। মণিলাল পাশের ঘরে। খাসিয়া আর বাংলা ভাষায় খিচুড়ি করে যা সে পরিবেশন করচে দুই খাসিয়ানী বোনের কাছে—তা সুখশ্রাব্য যে নয়, তার বলবার ভঙ্গীতে ও ভাষার ব্যবহারে বেশ বোধগম্য হলো আমার! কিন্তু আগের মতোই অবাক করলো আমাকে—ঐ দুই নারী। কি সুখে, কিসের জন্যে তারা ঐ মাতালের আশ্রিত হয়ে, অপমান, অবহেলা, নীরবে সহ্য করচে, কে জানে। কংয়ের কথা তবু বেশ বোঝা যায়। আশ্রয়হীনা। অতএব অপমান, অবহেলা তার প্রাপ্য! কিন্তু প্রে? টাকার লোভে? এমন অর্থবান নারী-সন্ধানী পুরুষের সন্ধান সে পায়নি বুঝি, যাকে সে তার যৌবনভরা দেহ আর মাধুর্যভরা হৃদয়ের বিনিময়ে পেতে পারে আদর, যত্ন, ভালবাসা? সংসারের লোভ? ওদের সামাজিক বন্ধনহীন গ্রন্থি ছিঁড়ে যেতে কতক্ষন? মাতালের খেয়াল, পুরুষের মোহ, দুই বালির ভিত্তির পরে প্রে রচনা করেচে আর আত্মবিশ্বাসের বেদী; আর তারই 'পরে রচনা করেচে নাকি প্রেমের প্রতিমা? হয়তো অন্ধ ভালবাসা প্রে কে প্রেমান্ধ করে রেখেচে।

আর দেখ্ যখন যা লাগবে দিবি! বুইলি? কোনো রকম অযত্ন হয় না যেন! …আমি শুনতে লাগলাম মণিলালের ধমকানি :

আমি এসে যদি শুনি অযত্ন হয়েচে, কেটে কুচিয়ে ফেলবো। ও চাঁদ মুখ দেখে ভুলবো না। বুইলি? এই ওষুধ এনেচি, খাওয়াবি ঠিক টাইম মতো। ওয়াৎ খেৎ, ভুলোনা! দু'দাগ খেলেই সেরে যাবে, দত্ত বলেচে, বুইলি? খানিকটা কিয়াদ খেলেই পারতো, সেরে যেতো! তা তো খাবে না। আমার দোস্ত,—কিন্তু ভাল—লোক বাভা। আমার মতো আউরিয়া না, বুয়াইদ না, খে্‌মরেন না। যা তা লোক না। বুইলি! যত্ন করবি। ওর কেউ নেই। টুগা নেই, তোর মত থিন্না নেই। একলা মানুষ। কিন্তু খবরদার, ওর সঙ্গে লেইত করতে যাসনে! লাথিয়ে ঠিক করে দেবে। হুঁ হুঁ বাব্বা: আমাকে পাওনি।

শুনতে পেলাম প্রে-র গলা। লজ্জা পাওয়া স্বর: ক্রেন মিয়ান। আস্তে বলো।

ঠিক্ ঠিক্। খেয়াল হলো মণিলালের: ওর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। আমি উঠি। যা বললাম, ঠিক করিস!

বালেই, ফিন লেইত্‌নো? যাচ্চো নাকি? প্রের গলা।

হাওয়েদ্। বুদ্ ইয়াংগা। মণিলালের গলার আওয়াজ আর পাওয়া গেলনা।

একটু পরেই সামান্য চোখ ফাঁক করে দেখলাম, মণিলাল স্খলিত পায়ে, অথচ অতি সন্তর্পণে, আমার ঘরের ভিতর দিয়ে সদর দরজার দিকে গেল। যাওয়ার সময় একটু নজর করলো আমার দিকে। আমি একটু চোখ চেয়ে দেখলাম মণিলালের যাওয়া। পেছনে প্রে! এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। দুজনেই বেরিয়ে গেল বাইরে দরজাটা টেনে দিয়ে। বাইরের দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া ভরে গেল ঘরের ভিতরটায়। লেপটা গলা পর্যন্ত টেনে

চোখ বন্ধ করলাম।

কিন্তু কানে এলো চাপা শব্দ, বাইরের নির্জন অন্ধকার বারান্দায়। নিস্তব্ধ প্রথম রাত্রের অস্ফুট কথা, ঘরের কাঠের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে ছেঁকে এসে যেটুকু খাপছাড়া কানে এসে ঢুকতে লাগলো, তাতে বুঝলাম, মণিলাল বিদায় রাত্রের সম্ভাষণ জানাতে উদ্‌গ্রীব, আর প্রে-র দুর্বল আপত্তি। মণিলালের চাপা অথচ দৃঢ় গলার স্বর এলো কানে। থামা থামা কথা। কাটা কাটা কথা। ছোট ছোট কথা। ডো ইয়াংগা, চুমু দাও! পিয়াম ইয়াংগা, জড়িয়ে ধরো! সেই সঙ্গে প্রের ভীত বিহ্বল স্বর: এম্ এম্—না, না। খেই লেইতনো। যাও তুমি! কাঠের বারান্দায় উৎকণ্ঠা জাগানো শব্দ! নারীর কাকুতি, পুরুষের যুক্তি, বুঝি শক্তি প্রয়োগের আবছা ইঙ্গিত। কাপড়ের খস্ খস্! চুড়ির রিনি ঝিনি। আর কোন কথা নয়। সৃষ্টির মহোৎসব। নিঃসঙ্গ পাইনের দীর্ঘশ্বাস। হা হা রব। হু হু রব। সব নীরব!

সহসা চঞ্চলতা। ত্রস্ত, ব্যস্ত! খেই লেইত্‌নো! খেই লেইত্‌নো! যাও তুমি, যাও!

মদ ও মদন মত্ত মহাজন তার পাওনা সুদ আদায় ক'রে বিদায় নিল। ঋণী এলো নিঃস্ব হয়ে ঘরে ফিরে!

একটু পরেই আমার ঘরের আলো জলে উঠলো। আমি ঘুমের ভান করেই পড়ে রইলাম।

বাবু! দাওয়াই! কংয়ের দ্বিধা জড়িত কণ্ঠস্বর!

উত্তর দিলাম না। গাঢ় ঘুমের ভাণ।

বাবু! দাওয়াই!

নিষ্পন্দ আমি।

বাবু!

এঁ্যা! আর উত্তর না দেওয়া ভাল দেখায় না।

দাওয়াই।

হঁ্যা!

লিজিয়ে।

হুঁ!

ঘুম ভাঙার অভিনয় শেষ করে উঠে বসলাম: দাও।

ওষুধ আর জল খেয়ে ধপাস্ করে শুয়ে পড়লাম আবার। চোখ বন্ধ।

কুছ্ খাওয়া?

নাহি!

বার্লি!

উহুঁ! বহুৎ নিদ্! বাতি বুতাও।

প্রে। তুমি এলে না কেন জানি! তুমি পাহাড়িয়া উপবনের লজ্জাবতী লতা। পাইনের পণ্যা তুমি। আমি বুঝি তোমার লজ্জা!

কে?

আমি!

প্রে?

হঁ্যা।

বাইরের ঝমঝম শব্দ কানে গেল।

বৃষ্টি পড়চে নাকি?

হ্যাঁ।

পা টিপচো কেন?

বহুৎ ছটফট হচ্চিল আপনার! গতরমে দরদ নাকি?

হ্যাঁ।

আঁ-উঁ বলছিলেন আপনি! কোষ্ট হচ্চিল, না?

হ্যাঁ। ঘুমের ঘোরে হয়তো ঐ রকম করছিলাম! তা তুমি কষ্ট করে এলে কেন?

শব্দে আমার নিদ্ টুটে গেল।

তাইতো, তোমার কষ্ট হলো।

কুছ্ না। থোরা আরাম হোচ্চে?

তা হোচ্চে! তবে যাও তুমি, ঘুমোও। ক'টা বাজলো এখন?

রাত একটা দুটা হোবে।

আপত্তি করলাম: না, না। আর তুমি জেগো না। শরীর খারাপ হবে।

ঠিক আছে। প্রে আগের মতোই লেপের তলায় হাত ঢুকিয়ে পা টিপতে লাগলো:

আপনি নিদ্ যান। আমি পা টিপি।

নিদ্ যান বললো বটে, কিন্তু নিদ্ নেই আঁখিপাতে। বাইরে বৃষ্টির ঝমঝমানি। ভিতরে থমথমে অন্ধকার। নির্জন ঘর। পায়ের কাছে সুন্দরী যুবতী। পদ সেবায় রত। বুকের মধ্যে হামানদিস্তার আঘাত ধপ্ ধপ্। নিদ্ ভেঙে চুরমার। মণিলাল। বন্ধু। উপকারী। পরীক্ষা! মানুষ আমি। রক্তে আগুন। নরম নারী। চেখে দেখো। নরম হাত। টিপে দেখো। রসিকতা। সত্যি হবে? মণিলাল। তুমি দায়ী। মানুষ

আমি। বিশ্বাসহন্তা? ক্ষতি কি? কলিকাল। এই রীতি! বাইরে ঝড়। ভিতরে ঝড়। প্রেমিকা প্রে।

জানালার সার্সির ভিতর দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক আলো। বিদ্যুৎ। ঘরের কালো কেটে গেলো। মনের কালো? সেখানেও দেখা দিল হঠাৎ আলো! ধমক দিলো। থমকে গেলাম।

বলি, হচ্চে কি? লজ্জা করে না? তোমার বন্ধু। উপকারী বন্ধু। বিশ্বাস করে তোমায়। আর তুমি? ছিঃ ছিঃ। ঐ প্রে। তোমার কষ্ট দেখেই এসেচে। তোমায় শ্রদ্ধা করে বলেই এসেচে। তাই নিঃসংকোচে এসেচে। আর তুমি নির্লজ্জ, অমনি লালসায় লোলুপ হলে? ওর দেহটাই কাম্য, শ্রদ্ধা নয়? বোকা। শাশ্বতকে ছেড়ে অসত্যের পেছনে ধাওয়া? তুলসীমঞ্চ ছেড়ে পাঁকে গড়াগড়ি? ভেবেচো, মণিলালের প্রেমিকা তোমারই বা হবেনা কেন? সহজলভ্য ভেবেচো? পুরুষ তুমি, জোর করলে হয়তো তার দেহ পাবে, মন নয়। মান খোয়াবে? অপমানের ভয় নেই? ছিঃ ছিঃ।

ভালো লাগে, চেয়ে দেখো। শুধু চেয়ে দেখো। মনে বলো, আহা মরি। মনে হবে, যুগ যুগ ধরি, ওরূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। না পাওয়ার আনন্দ, পেয়ে গেলে বোঝা যায় না। ভালো যদি কিছু দেখো, ভালো চোখেই দেখো। অকুণ্ঠ প্রশংসা করো, আকণ্ঠ পেতে চেয়ো না। ফুলের পাপড়িতে যে সুগন্ধ মাখানো, পাপড়ি আঙুলে হাজার ঘসলেও তার বেশি পাবে না, বরং সে সুগন্ধের হবে অপমৃত্যু, আর তুমি পাবে লজ্জা।

লজ্জায় হাত গুটালাম। লোভাতুর হাত সরিয়ে আনলাম। মন বললো, বিবেক তোমার কথা আমি বুঝেচি। পদ্মের রূপে গন্ধে লোভাতুর হয়ে টেনে ছিঁড়তে গেছলাম তাকে মণিলালের রস সরোবর থেকে। ভুলে

গেছলাম, ঐ পদ্ম, পঙ্কজ। টানা ছেঁড়াতে জল হবে পংকিল, ছিন্নবৃন্তের পদ্ম যাবে শুকিয়ে।

প্রে-পদ্ম দেখি নুয়ে পড়েচে! তার উঁচু করা ডান হাঁটুর উপর মাথাখানি কাত করে রাখা! তার ডান হাতখানা রাখা আমার পায়ের 'পরে। প্রে ঘুমুচ্চে। নিশ্চিন্ত, নিঃসংকোচে ঘুমুচ্চে সে। কোনো সাড়া নেই। বাইরে নেই, ভেতরেও নেই বুঝি।

আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম। নড়ালাম না পা—পাছে ওর ঘুম ভেঙে যায়। বেচারি। ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহ নিয়ে এসেছিল সেবা করতে; কখন নিজের অজ্ঞাতেই পড়েচে ঘুমিয়ে। লজ্জা পাবে, যদি দেখে আমি জেগে, আর ও ছিল ঘুমে অচেতন।

তাই চুপ ক'রে পড়ে রইলাম।

প্রে তুমি ঘুমোও। আমি ঘুমের ভাণ করে থাকি। নড়বো না বোন, পাছে তোমার ঘুম ভাঙে, লজ্জা পাও। ঘুমোও প্রে, বাইরের ঝড়-জল হয়ে এসেচে স্তিমিত।

নিস্তব্ধ ঘর, শান্ত। মনও।

যাদু জানো নাকি তুমি প্রে? মাথাটাও আজ সকালে দেখচি খুব হাল্কা। জ্বর কম। গায়ের ব্যাথাও কম। আজ যদি ভাল থাকি, কাল উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবো। তোমার ভয়েই অসুখ পালালো বুঝি। বেরুবে তো বাজার করতে, দিয়ো খবরটা ডাক্তারবাবুকে। বলো, আর আসবার দরকার নেই, ভালোই আছি। ঐ ওষুধটাই চলবে কিনা শুনো। কি খাবো, জেনে এসো। অবশ্য, যদি মনে করেন, বুকটা এসে দেখে যেতে পারেন

ভালো কথা, একখানা খবরের কাগজ আনতে পারবে কিনে ? না, কাগজ তো আবার সকালে পাওয়া যাবে না। মেল-বাস এলে, তবে। তা হলে কি করা যাবে সারাটা দিন বলো তো ?

তাইতো ! প্রে চিন্তিত হলো !

এক কাজ করো, বললাম : আজ দুপুরে তুমি আমাকে তোমাদের খাসিয়া ভাষা শেখাবে। দু' একদিনে আর কি শিখবো ? বরং দরকারি কথাগুলোর খাসিয়া মানে লিখে নেবো কাগজে, তাই দেখে দেখে কথা বলা যাবে। বেশ হবে !

হাঁ, হাঁ, বেশ মোজা হোবে !

মণিলাল কিন্তু বেশ খাসিয়া বলে, না ?

হাঁ। বহুৎ রোজ আছেন কিনা ?

তুমিও কিন্তু বাংলা মন্দ বলো না ?

আপনার বন্ধু শিখাইছেন।

মণিলাল কবে ফিরবে জানো ?

না ! তোবে দু' তিন রোজ হোতে পারে !

ও এলেই আমাকে যেতে হবে ! বললাম : হঠাৎ এই অসুখে পড়ে তোমাদেরও কষ্ট দিলাম, আমারও কাজের ক্ষতি ! আচ্ছা, তুমি এসো, বেলা হয়ে যাচ্ছে !

প্রে জুতো জোড়া পরে নিয়ে ব্যাগ হাতে নেমে গেল কাঠের সিঁড়ি বেয়ে খট্ খট্ করে।

দুপুরে পেট ভরে দুধ-বার্লি খেয়ে প্রে-কে বললাম : এবার এসো কাগজ পেন্সিল নিয়ে, শেখাও আমাকে খাসিয়া ভাষা !

প্রে হেসে বললো : খুব তো জুলুম মালুম হোচ্চে। আপুনি তো খেয়ে ঠাণ্ডা হইলেন, আমি ?

ঠিক তো ! কেমন স্বার্থপর, দেখলে তো ? বললাম : যাও ছুটি এক ঘন্টা ! তাড়াতাড়ি সেরে এসো। জানো, আমি অতিথি, তোমাদের দেবতা !

ঠিক্ ! ঠিক্ ! প্রে বললো : থোড়া সবুর দেবতা ! আগে পেট ঠাণ্ডা হোক্, তব্ মাথা ঠাণ্ডা হোবে, লিখাপড়া হোবে।

প্রে চলে গেল ঘর থেকে। আমি চোখ বুজে প্রে-র কথা, প্রভার কথা, মনিলালের কথা ভাবতে ভাবতে শিলং পাহাড় থেকে এক লাফে নীচেয়। এক নিমেষে কলকাতায়। বাড়ীতে। সদর দরজা বন্ধ ! ক্ষতি নেই। লাফ মেরে দোতলায়। দুপুর বেলা মা ঘুমুচ্চে। ভাত দাও। অফিস। কিরে, কবে এলি ? দেরি হ'লো ফিরতে ? আর ভাই, অসুখে পড়েছিলাম। শরীরটা আজো দুর্বল। তবে রাত্রে ট্রেনে ঘুমিয়েচি। খুব ঘুম !

প্রে ! প্রে !

দরজায় ধাক্কা আর কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে এক খাসিয়ানী। যৌবন শেষবতী। রুক্ষ বেশ কেশ ; কান্নায় ভেঙে পড়েচে যেন। প্রে-র বাড়ীতে আমার মতো অপরিচিত এক বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দেখে খাসিয়ানীটি তার কান্নার বন্যায় বাঁধ বেধে দিলো যেন। থমকে গেল। অবাক হলো ! কিন্তু মুখখানা কান্নায় থমথমে !

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বললাম : প্রে ভিতর যে হ্যায়। ভিতর আও।

মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দুর্বল শরীরে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। হয়তো কং মেয়েটির গলা শুনতে পেয়েই এ ঘরে এসে দাঁড়ালো। বুঝলাম, মেয়েটি ওদের চেনা। খাসিয়া ভাষায় কি যেন জিগ্যেস ক'রে—কং ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভিতরের ঘরে! আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো মেয়ে। শব্দ এল কানে!

শুনেচি, দেখেচিও, শিলংয়ের স্ত্রী স্বাধীনতা। তবু এখানকার মেয়েরাও কাঁদে, আমাদের দেশের অসহায় মেয়েদের মতই! কান্না, অভিমান, কৌতুহল দিয়েই মেয়েদের মন গড়া—এ মন গড়া কথা নয়! স্কার্ট, শাড়ি, ঘাঘরা, পায়জামা মেয়েদের ভৌগলিক তারতম্য বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়তো, ওদের মন বোঝাবার দিক দিয়ে অনর্থক। মেয়েদের মনের ফল্গুধারা সারা পৃথিবীর নারী জগতের ভিতর দিয়ে সমানভাবেই স্রোতস্বিনী। এদেশের প্রে, প্রভা, ওদেশের ডরোথী, জেনী বা চীন জাপানের লিংসাউ বা ওহানা দেবীদের জন্যে ভগবানের তৈরি মেয়ে-মনের-ছাঁচ বোধ করি একখানাই।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে এবার প্রে এলো। মেয়েটির হাতে একটা থালায় কিছু চাল, আলু, কলা আর একটা বাটিতে মনে হলো ডাল। মেয়েটি আমার দিকে একবার চেয়ে মাথা নীচু করে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে। প্রে তাকে খাসিয়া ভাষায় কী যেন বলতে বলতে দরজা খুলে দিয়ে তাকে বাইরে যেতে দিয়ে বন্ধ করলো দরজা!

কে ও? জিগ্যেস করলাম প্রে-কে।

ওর নাম আছে ব্রীল্, কা ব্রীল্—প্রে সামনের চেয়ারে এসে বসলো : মেয়েটার বোড়ো কোষ্টো। স্বামীটা ভালো না। রিক্সন লিণ্ডো লোকটার নাম। আমাদের পাড়াতেই থাকে, এই ক'খানা বাড়ীসে নীচে। আমরা একসাথে ইস্কুলে পড়া কোরতাম। সেই থেকে ভাব আছে। সেন্ট মেরিস কলেজের পাশের নীচু পোথটা আর আপল্যাণ্ড রোড যেখানে লাই-মুখ্রা সড়কে এক হোয়েচে উইখানে এক বাংগালী বাবুর ডুকান ছিলো। ব্রীল্ তো উ ডুকান থেকে মাল পত্তর সওদা করতে করতে উই বাবুর সোঙ্গে বহুৎ জানাশুনা হোয়ে গেলো। আমাদের এক বন্ধু, তার নাম ছিল রোজ, কা রোজ, বেইমানী করলো। ব্রীল্কো নানাকে মানে দাদুকে সব বোলে দিলো। দাদু তো বহুৎ গোঁসা করলো; বললো, কেটে ফেলবো উকে। শেষকালে তাড়াহুড়া করে সাদি দিয়ে ঘরে আনলো ঐ মাতাল রিক্সনকে।

ঘরে আনলো মানে? বললাম : ওকে ঘর-জামাই করলো বুঝি?

প্রে হাসলো : ঠিক ঠিক, আপনি তো জানেন না। আমাদের নিয়ম। সাদির পরে স্বামী আমাদের ঘরে আসে। আর উতো ছোটা লেড়কী না। তাই উর দাদু, বাবা মা, মরবার পর পেলো সব কুছু ব্রীলের ছোটা বহিন ব্রেন। উর স্বামীটাও মার ধোর লাগালো। কুছু কাজ কোরবে না, শুধু মদ গিলবে, আর মদের রূপেয়া না মিললে ব্রীলের চুলের মুঠি ধরে মারবে। উ ওতো টাকা কুথায় পাবে? একটা কারখানায় কাজ মিললো তো, সে কারখানার মালিক উর উপর নজর দিলো, রূপেয়া দেখালো। কিন্তু ব্রীল্ বুড্ডাকে এক রোজ খুব গালাগালি করে উ নোকরি ছেড়ে দিলো।

তা এখন কি করে চলে ওর? কৌতূহলী আমি।

সে বোড়ো লোজ্জার কথা। প্রে লজ্জা পেল যেন।

বললাম : না, না। অসুবিধে থাকে, দরকার নেই বলবার।

অসুবিধা কুছু নেই,—প্রে বললো : বরঞ্চ আপনাকে বলতে ক্ষতি নেই। খাসিয়ানীদের জীবনটা বোড়ো দুঃখের আছে। আমাদের পুরুষগুলোর কোনো জোর নেই, কোনো দায় নেই। কুছু করবারও চেষ্টা নেই। শুধু মারবার বেলা ঠিক আছে। আমাদের খাবে, আবার মারবে, এমন নেমকহারাম। তোবে আজকাল কুছু কুছু ভাল হোচ্চে, লিখাপড়া শিখচে, ভালো ভালো কাজ উজ করচে। দেখা যাক্।

কথাটা ঘুরে গেল দেখে খেই ধবিয়ে দিলাম প্রে-কে : তা ব্রীল্ এসেছিল কেন ? চাল নিতে ?

হাঁ, উ অমন আসে। নিজে না খাক স্বামীকে তো চাঙা কোরতে হোবে, নইলে হাত চোলবে কেমন কোরে ? তাই পাঠাইছে চাউল আনতে।

ওদের অবস্থা তা হলে শোচনীয় ?

হোবে না ? চাকরি নেই। একটা ছেলেও আছে। তিনটা পেট্। শেষ পর্যন্ত পেটের দায়ে ইজ্জতও দিলো : কিন্তু পেট ভরলো না। উ বছর সিজন টাইমে যোখন বহুৎ লোক শিলংয়ে এলো, ব্রীল্ একঠো চা দুকান দিলো বাজারে ; সাত্ সাত্ পয়সালা বাবু দেখে ইজ্জৎও দিলো, আর মিললো অসুখ, বহুৎ খারাপ অসুখ। ডাংদার নিলো বহুৎ রূপেয়া, দুকান গেলো, খরিদ্দার গেলো—এখন ভিখ্ : ই হচ্চে আমাদের জীবন। যাক্, শিখবেন খাসিয়া ভাষা ?

প্রে সহসা ব্রীলের দুঃখোপখ্যানের সুতো ছিঁড়ে, নতুন সুতো ধরিয়ে দিলো হাতে। আপত্তি কি ? বললাম : হ্যাঁ।

তোবে কাগজ পেন্সিল আনি ?

আনো।

প্রে উঠে গিয়ে কাগজ পেন্সিল এনে আমার হাতে দিলো ঃ আপনি কি কোথা জানতে মাংচেন বাংলায় বলুন, আমি খাসিয়া ভাষায় সেই সেই কোথা বলবো, আপনি লিখে নিবেন।

ঠিক আছে। কাগজ পেন্সিল ঠিক করে বললাম ঃ বলোতো খাসিয়া ভাষায় কি হবে—তোমার নাম কি ?

লিখুন, ফি কিরতেং নেই ? প্রে বললো।

লিখলাম।

শিখতে লাগলাম খাসিয়া ভাষা।

পরদিন ছেড়ে গেল জর। সেরে গেল অসুখ। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভোগ ছিল, দুদিন ভোগালো। শরীর দুর্বল, মন কিন্তু চাঙ্গা। মনে জোর করতেই হবে। যেতে হবে তো কলকাতায় ?

কিন্তু মণিলাল কৈ ? আজো এলো না তো ? অথচ আজই কাটতে হবে টিকিট, যাতে কাল পারি রওনা দিতে। আর দেরি নয়। অথচ মণিলাল যদি চেরাপুঞ্জি থেকে ফিরতে দেরি করে, না দেখা করেই যেতে হবে নাকি ? হয়তো। উপায় নেই। রাগ করবে সে ; ভাববে অকৃতজ্ঞ। উপায় কি ? গিয়ে চিঠি দেবো, ক্ষমা চাইবো।

কবে আসবে মণিলাল ? জিগ্যেস করলাম প্রে-কে।

কুছু জানি না তো ? কেনো ?

কলকাতায় যাবো মনে করচি।

আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবেন না

ভাবচি তো তাই।

আর দু'দিন র'য়ে যান, দেখা হোবে।

তা হয়না প্রে, অনেক কাজ।

আপুনি চললে, আপনার বন্ধু বহুৎ গোঁসা হবে।

আমি চিঠি লিখে যাবো সব বুঝিয়ে।

প্রে চুপ করে রইলো।

মনে হলো, আমিই অপরাধ করচি। বললামঃ কী করবো? কলকাতায় অনেক কাজ পড়ে আছে। আর মণিলাল যে কবে ফিরবে ঠিক নেই। হয়তো কাজে আটকে গেচে সেখানে!

প্রে গম্ভীর গলায় বললো: কোবে চান যেতে?

কালই! আজ টিকিট কাটবো।

তোবে তো টাকাটা দোরকার হোবে। আনচি আমি।

প্রে গেল পাশের ঘরে।

আমি গুছিয়ে কাপড় পরে জামা গায়ে দিলাম। জুতো জোড়া পরচি, প্রে এলো ঘরে। হাতে টাকার নোট: এই লেন্!

নোট কখানা হাতে নিয়ে দেখি পাঁচখানা দশ টাকার নোট। বললাম: একি! সব টাকাই ফেরৎ কেন? মণিলাল হোটেলের খরচ দিয়েচে, ডাক্তার ওষুধেও খরচ হয়েচে।

উ আমি জানে না। প্রে বললো!

বেশ, আমি বললামঃ দশ টাকা আমি রাখি, চল্লিশ টাকা থাক, মণিলালকে দিয়ো।

উ আমি পারবে না। আপনার বন্ধু বহুৎ গোঁসা হবে! আর আপনার যাবার খরচা ভি তো চাই!

সে টাকা আছে আমার, ওর বাড়ীতে। বলে গেচে মণিলাল। ওর ওবাড়ীতে যাবো, টাকা নিয়ে আসবো, দেখাও করে আসবো ওর স্ত্রীর সঙ্গে! তুমি রাখো চল্লিশ টাকা।

সে আমি পারবে না।

মুস্কিল করলে তো?

হাসলো প্রেঃ তোবে থাকিয়ে যান, দুই বন্ধু হিসাব করে যা ঠিক হোবে কোরবেন!

বললামঃ বটে, আমাকে আটকাবার মতলব? আচ্ছা দেখি, কি করা যায়!

বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। হাত ঘড়িটায় দেখলাম; বারোটা বেজে দশ!

সবে সেদিন অন্নপথ্য করেচি।

চলতে গিয়ে দেখি হাটু দুটোয় জোর নেই। আস্তে আস্তে নামলাম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এলো প্রে। সিঁড়ির শেষে সরু গলি। নোংরা, উঁচু-নীচু। খাসিয়া বস্তির পাথুরে গলি। দু-তিনটে ছেলে, ছেঁড়া ময়লা জামা গায়ে, পাথরের টুকরো নিয়ে কী খেলচে যেন। একটা মা-মুরগী কতকগুলো বাচ্চা সমেত গম্ভীর ভাবে গলিটা পার হয়ে ঢুকলো একটা বাড়ীতে। বাড়ীটার সামনের ঘর থেকে কানে আসচে ইংরেজী কনসার্টের রেকর্ড বাজনা! ঘরটার জানালায় ঝুলোনো নীল পর্দা। গলির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে এক খাসিয়ানী যুবতী। আর্থিক দারিদ্র্য তার বাইরের বেশে; বয়সের স্বাভাবিক সম্পদে সে ধনী, গরবিনী! কিন্তু পেট রূপ চায় না; তবে রূপ দেখিয়ে রূপো আনলে ঘরে, পেটের কোনো আপত্তি নেই! তাই হয়তো ঐ মেয়ে তার

দেহের সম্পদ ভাঙিয়ে ঘরের সম্পদ বাড়াতে যায়,—বাড়ায় আপদ বিপদ, নষ্ট করে মান সম্ভ্রম, হয় পদস্খলন !

কিংবা নাও হতে পারে ও মেয়ে নষ্টা। আমারি ভুল। বস্তিতে আছে বলে ? আর আছে তার দেহে যৌবন ? তাই ভেবে নিতে হবে সহজলভ্যা, পণ্যা ? পাঁকে কি শুধু দুর্গন্ধই ? পদ্মও তো ফোটে ! প্রে, প্রেও তো থাকে এই বস্তিতেই। তার সেবাধন্য আমি, এখনও তার বস্তির সীমা পার হইনি—অথচ মনের কোনে খারাপ ধারণা উঁকি মারচে, তারই এক স্বজাতীয়া মেয়ের সম্বন্ধে !······মেয়ে, তুমি আমায় ক্ষমা করো !

অবাক হলো মেয়েটি। এই খাসিয়া বস্তিতে এক ধোপ-দুরস্ত বাংগালী বাবুকে দেখে বোধ হয়। মণিলালকে কি ওরা দেখেনি ? দেখেচে, তবে মত্তাবস্থায়, তাই আশ্চর্য হয়নি। স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েচে। তাই স্বাভাবিক গতিতে এক বাংগালী বাবুকে খাসিয়া বস্তিতে চলতে দেখলে—বিস্মিত হবার কথা বৈ কি !

বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। মেঘলা আকাশ। থমথমে ভাব। অশ্রু ঝরবার আগে কুমারীর মুখের অবস্থা যেন। পীচ দেওয়া কালো রাস্তায় নানা রংয়ের, নানা পোষাকে নানা জাতের মানুষ। আপন কাজে চলেচে। চলার শেষ নেই। কাজ নেই যার, সে কাজের জন্য পাগল ! ব'সে খাওয়া—এই ব্যস্ত সংসারে লজ্জার ব্যাপার !

মোটর অফিসে গিয়ে কালকের একখানা টিকিট কিনলাম। শরীর দুর্বল, অতটা পথ মোটরে নামতে হবে। প্রথম শ্রেণীর টিকিটই কিনলাম, যাতে ঝাঁকুনি কম লাগে।

কাছেই পুলিশ বাজার। সেখানে একটা দোকান থেকে কিনলাম কিছু লজেন্স, চকোলেট আর একটিন বিস্কুট। চললাম মণিলালের বাড়ীর দিকে।

যদি মণিলাল তার বাড়ীতে এসে থাকে, ভালোই হবে, দেখা হবে।

মণিলালের বাড়ীর কাছে এসে দেখি সদর দরজা বন্ধ। বাইরের ঘরের জানালার উপর দাঁড়িয়ে মণিলালের বড় ছেলেটি। পাশে ব'সে তার বোনটি।

জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। মণিলালের বড় ছেলেটিকে জিগ্যেস করলাম: তোমার বাবা কোথায়?

নেই তো?

কবে ফিরবেন জানো?

জানিনে তো!

আমাদের কথায় ছোট মেয়েটির মন ছিলনা—মন ছিল বোধ হয় আমার হাতের জিনিষগুলোর দিকে। জিগ্যেস করলো:

তোমাল হাতে ওতা কি?

হেসে বললাম: মজার জিনিষ!

দেকাবে?

দেখালে কি দেবে বলো?

কী দেবার আছে তার, মিষ্টি হাসি আর আধো-আধো কথা ছাড়া? তাই বোধকরি চুপ করে গেল। কিন্তু বড় জন ইতিমধ্যেই সাংসারিক জ্ঞান পেয়েচে হয়তো, বুঝেচে বাস্তব লেন-দেনের ব্যাপার। তাই প্রস্তাব করলো বিজ্ঞের মতো:

যদি দেখান তো আমার পেন্সিলটা দেবো আপনাকে!

তাই নাকি? বললাম: শুধু দেখবার জন্যে, অমন দামী জিনিষটা

দিয়ে দেবে ? ঠকা হবেনা তোমার ?

ছেলেটি চুপ হয়ে গেল এবার। বুঝলো, বোকামি করেচে। লেনদেনের বাজারে, অল্পের বদলে বেশি কবলেচে সে! এ যুগে কিছু দিয়ে কিছু নিতে হয়, জানে সে ; কিন্তু কতটা দিয়ে কতটা নিতে হয়, সে জ্ঞান আজও তার হয়নি বুঝে, সে বুঝি অপ্রস্তুত।

বললাম : যাক, দিতে হবে না পেন্সিল। বরং যা দেখচো হাতে, দেবো তোমাদের—দরজা খোলো দেখি!

দরজা যে বন্ধ! ছেলেটি বললো!

কেন ? খুলতে পারবে না দরজা ?

না, আমাদের ঘরের দরজাটাও যে বন্ধ। ছেলেটি বললো : মা বন্ধ করে দিয়েচে দরজা বাইরে থেকে।

তুমি তালে দেবেনা ওগুলো ? মেয়েটি ব্যাকুল হয়ে উঠলো পেয়ে হারাবার ভয়ে ?

বললাম : না, না দেবো বৈ কি ? তোমরা দুষ্টুমি করছিলে, তাই বুঝি মা ঘরে বন্ধ করে রেখেচেন!

না তো ? দুজনেই আপত্তি জানালো একসঙ্গে!

তবে ?

এমনি।

তোমার মার কাছে আমার একটা জিনিষ আছে। ঘুমুচ্চেন নাকি ?

ছেলেটি বললো : মামু এসেচে কিনা, গপ্‌পো করচে!

অবাক হলাম : মামু কে ? তোমাদের মামাবাবু বুঝি এখানে বেড়াতে এসেচেন ?

না না। ছেলেটি বললো : মামু আমাদের নিয়ে সেই যে এসেছিল

মামা বাড়ীর থেকে ? এখানে চাকরি করে।

জানো ? মেয়েটি জানালো ঃ মামু, আমাদেল লোজ পয়চা দেয় ?

তাই নাকি ? বললাম ঃ বেশ ভালো মামুতো ? তার সঙ্গে ভাব করতে হবে। তা রোজ আসেন বুঝি তিনি ? কখন আসেন ?

না গো, রোজ না। ভাইটি বোনটির ভুল শোধরালো ঃ কাল এসেছিল দুপুরে। জানো, মামু এলেই মা আমাদের বিস্কুট দিয়ে ঘরে বন্ধ করে দেয়। মামুর সঙ্গে অনেক দরকারি কথা থাকে কিনা ? আর আমরা যদি গোলমাল করি, তাই !

দুটি সরল শিশুর কাছে একটি জঘন্য বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে মন সায় দিচ্ছিল না, তবু যেন দরকার আছে এ খবর নেবার ! কিন্তু মণিলাল তো নাবালক নয়, বোকা নয় ! তার সংসারে, ঘরোয়া ব্যাপারে আমার নাক ঢোকানো অভদ্রতা ! তা'বলে তুমি দেখবে না, জানবে না, বুঝবে না সঠিক ব্যাপারটা ? ভয় পেয়ে পালাবে ভীরু ?

আচ্ছা, এই নাও তোমাদের জিনিষ ! জানলা গলিয়ে লজেন্স চকোলেটগুলো ওদের হাতে দিলাম। লুব্ধ হাত চারখানা বার করে তারা ওগুলো আত্মসাৎ করলো। কিন্তু ভদ্রতা ভুললো না বড়জন, বললো ঃ

আপনি আসুন বাড়ীর মধ্যে।

কেমন করে যাবো বলো ?

কড়া নাড়ুন সদর দরজায়।

তাই নাড়ি।

দেখা যখন করতেই হবে, সদর দরজায় কড়া নাড়লাম। কোনো সাড়া নেই।

আরো জোরে নাড়ুন ! ছেলেটি জানালা থেকে চেঁচালো এবার।

জোরেই এবার নাড়লাম কড়া।

কে এ-এ? ভিতর থেকে গলা পেলাম প্রভার।

দরজা খুলুন, আমি।

একটু পরেই ভিতর থেকে শব্দ হলো দরজা খোলবার। শেষে ফাঁক হলো দরজা একটুখানি। সেই ফাঁকে দেখা দিল প্রভার মুখ, রাহুগ্রস্ত চাঁদ যেন।

আপনি? প্রভার সারা মুখখানায় বিস্ময়, শংকা। ছোটো কপাল-খানায় সিঁদুরের ফোঁটার লম্বা লাল রেখা টানা। নিষেধের লাল দাঁড়ি নাকি? এখন আসতে মানা?

জিগ্যেস করলাম: খুব অবাক হলেন, না? হাসলাম আমি: বিশ্বাস করুন, আপনাকে বিরক্ত করার ইচ্ছে ছিল না আমার—

না, না—বাধা দিল প্রভা: বিরক্ত হবো কেন?

এসেচি আমার টাকাটা নিতে। কাল সকালে রওনা হচ্চি কলকাতায়। মণিলাল কবে আসবে জানেন?

পরশু, সোমবার সকালে ফিরবেন বলেছিলেন।

তবে আমার সঙ্গে দেখা হবেনা, এলে বলবেন।

আচ্ছা!

তা'লে টাকাটা দিন, যাই!

দিই!

দরজাটা ঐভাবে সামান্য খোলা রেখেই প্রভা চলে গেল ভিতরে। বোধহয় অভদ্রের মত ভদ্রলোকের মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করতে পারলো না। সুযোগ নিলাম আমি। ঢুকলাম ভিতরে। এগিয়ে গেলাম নিঃশব্দ পায়ে মণিলালের ঘরের দিকে। দাঁড়ালাম দরজার সামনে!

প্রভা আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো। অনাহুতভাবে বাড়ীর ভিতরে এসে দাঁড়াবো, অতটা ভাবতে পারেনি সে।

বললাম : এক গেলাস জল দেবেন কি? গলাটা শুকিয়ে গেচে। শরীরটাও দুর্বল! তবু বসতে বললো না প্রভা। বললো : আনচি জল!

বললাম : তার আগে যা করছিলেন করুন, টাকাটা বার করুন।

প্রভা তার অগোছালো কাপড়ের আঁচল থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুললো। আলমারির একটা পাল্লায় আর্সি লাগানো। পাল্লাটা খুলতেই ঘরের ভিতরটা প্রতিফলিত হলো আর্শির মধ্যে!

প্রভা ভিতরের দেরাজ খুলছিল হঠাৎ আমার নজর পড়লো আর্শিতে : ঘরের কোণের আলনায় সাজানো জামা কাপড়ের ফাঁকে একটা চোখ জ্বল জ্বল করচে, দেখা যাচ্চে কালচে মুখের একটা ফালি!

চমকে উঠলাম। অবশ্য ক্ষণেকের জন্য! বলতে কি, খুশি হলাম যেন— একটা হঠাৎ পাওয়া জিনিষের খোঁজ পেয়ে। অনাহুত হয়ে নির্লজ্জের মত, অভদ্রের মতো বাড়ীর ভিতর আসার পুরস্কার পেলাম যেন!······পরক্ষণেই মনে হলো, ছেলে মেয়েটির কথা যদি মিথ্যে হতো, তাহলে কি সুখেরই না হতো! গোয়েন্দাগিরিতে সাফল্যের আনন্দ পেলাম বটে, কিন্তু হতে হলো জঘন্য বাস্তবের সম্মুখীন!

আলমারি বন্ধ করে, প্রভা টাকার মনিব্যাগ এনে আমার হাতে দিলো। বললো : আসুন রান্নাঘরে, জল দিচ্চি।

না, থাক! দরকার নেই জল! কেমন যেন বিতৃষ্ণা অনুভব করলাম। ছিঃ, ছিঃ, স্ত্রী হয়ে, মা হয়ে—

প্রভা জিগ্যেস করলো : কেন, জল চেয়ে জল খাবেন না, কি হলো?

কিছু না, এমনি !

বুদ্ধিমতী প্রভা ছাড়লো না : এমনি বললেই হলো, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে !

হয়তো আছে ! নিস্পৃহের মতো বললাম !

তবে বলুন কারণ !

শুনবেনই ?

আপত্তি কি ?

না, আপত্তি আমার দিক থেকে নেই। আপনি শুনতে চাইলে, আমার বলতে বাধা কি ?

বলুন তবে !

বলছিলাম, এখানকার রকম-সকম দেখে গলা আমার শুকিয়ে গেচে যে। গেলাস কেন, কলসী কলসী জল গলায় ঢাললেও প্রাণ ঠাণ্ডা হবে কিনা জানিনে।

এমনি ব্যাপার ? মুখ শুকিয়ে গেল প্রভার, তবু নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই ব্যঙ্গ করলো সে :

ভূত দেখেচেন বুঝি ?

ভূত দেখলেও আশ্বস্ত হতাম ! হাসলাম আমি। যা দেখেচি, তা না দেখলেই ভালো হতো !

প্রভা এবার রাগ দেখালো : হেঁয়ালি ছাড়ুন, কী দেখেচেন বলুন, বলতেই হবে !

তবে গোপনেই বলতে চাই। বললাম আমি !

প্রভার মুখ ফ্যাকাসে : এখানে আর কে আছে, আপনি আর আমি ছাড়া ? ঐ ঘরে ছেলে মেয়ে আছে, ঘুমুচ্চে বোধ হয় !

না, ঘুমোয় নি।···হাসলাম আমি : বন্দী অবস্থায় তারা জেগে আছে। তবে যাতে আমাদের কাজের কথায় গোলমাল না করতে পারে, আপনার মতো আমিও ঘুসের ব্যবস্থা করেই এসেচি, লজেন্স-চকোলেট !

প্রভা প্রায় চীৎকার করে উঠলো : কী বলতে চান আপনি, খুলে বলুন !

বললাম : বলেচি তো, গোপনে বলতে চাই !

তবে বলতে পারেন, কেউ নেই এখানে !

কিন্তু আমি যে মানুষের গন্ধ পাচ্চি ; হাঁউ-মাঁউ খাই, মানুষের গন্ধ পাই! ঠাট্টা করে বললাম : আল্‌নার কাছে যাই ?

এমন সময় চকিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এক যুবক। ফুলপ্যান্ট আর সার্ট পরা, চুল এলোমেলো। প্রভা ঘরের দরজার দিকে পেছন করে আমার সঙ্গে কথা বলছিলো ; তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে গেল সদর দরজার দিকে। দুজনেই আমরা লক্ষ্য করলাম, তার সার্টের খানিকটা পেছন দিকে প্যান্টের বাইরে বেরিয়ে, ভালো করে গোঁজা নেই ! সদর দরজাটায় শব্দ হলো দড়াম্ করে ; আর দেখা গেল না ছেলেটিকে !

একটা দমকা ঝড় বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে গেল যেন। প্রভার মুখখানায় কালো মেঘ নেমে এলো, থমথমে।

হেসে উঠলাম আমি, বিজেতার হাসি, নিষ্ঠুর হাসি। কর্কশ, যেন বজ্রের গর্জন !

হঠাৎ আমার হাত দুখানা চেপে ধরলো প্রভা : বিশ্বাস করুন, ও আমার দাদা !

প্রভার চোখে অশ্রুধারা !

আলুলায়িত কেশ, বেশ। কেশরাশি ছড়িয়ে পড়েচে সারা পিঠের 'পরে, ঘাড়ের 'পরে। বক্ষবাস স্থানচ্যুত। সুঠাম দেহবল্লরী থরথর কাঁপচে, কাঁপচে ফ্যাকাসে ঠোঁট। সজল চোখে মিনতি ভরা, আচরণে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত।

আসুন, ঘরে আসুন, বসুন। বলচি আমি সব।—হাত ধরে টানলো প্রভা।

কি আছে আপনার বলবার?—হাত ছাড়িয়ে নিলাম আমি।

ছলছল চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে সানুনয়ে বললো: আছে, আছে বলবার। অনেক কিছুই আছে বলবার!

কী বলবার আছে ঐ নারীর? কী জবাবদিহি দিতে চায়? শুনবো? ঢুকবো ঘরে? বসবো? না। মিথ্যে ছাড়া, ওর কিছু নেই বলবার। অনুনয় ছাড়া, ওর কিছু নেই করবার। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বোকামি, বিপজ্জনক। যে ডুবচে, সে সামনে যাকে পায় তাকেই চায় জড়িয়ে ধরতে। যদি ভাসলো তো ভাসলো, নইলে ডোবে তাকে নিয়েই। না, আর ভাববার সময় নেই।

কঠোর হ'য়েই বললাম: আপনার ঐ পাপ আচরণকে ঢাকা দেবার জন্যে মিথ্যে কথা শোনবার আমার সময় নেই। যদি ও আপনার দাদা-ই হয়, তবে অমন আলনার পেছনে লুকিয়ে ছিল কেন? লুকোচুরি খেলবার কী দরকার ছিল? আর আমাকে দেখে পালিয়েই বা গেল কেন চোরের মত? ছি, ছি, স্ত্রী হ'য়ে, মা হ'য়ে—যাক্, চললাম আমি।—এগিয়ে গেলাম সদর দরজার দিকে।

প্রভা হঠাৎ খপ্ ক'রে আমার পাঞ্জাবির পেছনের কোন্‌টা চেপে ধরলো: না, না যাবেন না, শুনুন।

কিন্তু আমি না থামায় টান লেগে ফ্যাস ক'রে ছিঁড়ে গেল কোন্‌টা। অপ্রস্তুতে প'ড়ে কোন্‌টা ছেড়ে দিল প্রভা, ছাড়ান পেলাম আমি।

ছেঁড়া কোন্‌টার দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বললাম : কেন বিরক্ত করচেন ? আপনার বাজে কথা শোনবার সময় বা উৎসাহ নেই আমার।

আর দাঁড়ালাম না। বেরিয়ে এলাম পথে।

সদর দরজায় আর একবার শব্দ হ'লো : দড়াম্‌!

প্রভার হাতে পাঞ্জাবিটার ক্ষতি হ'লো কিন্তু বাঁচলাম আমি। একটু দিয়ে বাঁচানো গেল বেশিই।

সোজা এসে বসলাম, লেকের এক বেঞ্চে। মাথায় সব গুলিয়ে গেচে। দূর, দূর, কী দরকার ছিলো এসব করবার ? শুধু মেজাজ খারাপ করা। যা হচ্চে, হ'তে দাওনা বাপু! তোমার তাতে কী আসে যায় ? সংসারে পাপ আছে, পুণ্য আছে ; দুঃখ আছে সুখ আছে—থাকবেই! শুধু ভালোটা থাকবে, মন্দটা থাকবেনা, এমন স্বর্গরাজ্য কোথায় পাবে বলো ?

অবশ্য, এতদিনে বুঝলাম, মণিলালের দুঃখ কোথায় ? কেন সে তার স্ত্রীর কথা উঠলেই, ঘুরিয়ে নিতো কথা! মদের ঝোঁকে বলতে গিয়ে সামলে গেচে সে! কিন্তু মণিলালের দুঃখের কারণ তো মণিলালই। দুঃখ দিলে তো দুঃখ পেতেই হবে ; এই তো নিয়ম। আঘাত দিয়ে যদি প্রতিঘাত সহ্য করতে না পারো, আঘাত দেওয়া কেন ? ব্যবহারিক হিসাবে মণিলালের ঋণ প্রভা শোধ দিচ্চে বুঝি কড়ায়-গণ্ডায়!

আর না, সন্ধ্যে হয়ে এলো। লেকের বেঞ্চ ছেড়ে উঠলাম। ঠাণ্ডা পড়চে বেশ। বেশিক্ষণ বাইরে থাকা অন্যায় হবে। সেই বারোটায় বেরিয়েচি, এবার ফেরবার জন্যে পা বাড়ালাম।

এগুলাম পুলিশ বাজারের দিকে। একটি দোকানে ঢুকলাম। কিনলাম একছড়া ঝুটো মুক্তোর মালা—মণিলালের মেয়েকে গিয়ে দিতে হবে। সতী! মুক্তোর মতোই শুভ্র, নির্মল সুন্দর; কিন্তু সমাজের চোখে ঝুটো, কোনো দাম নেই, অপাংক্তেয়!

ফিরে এলাম প্রে-র বস্তিতে, মণিলালের অপকর্মের ডেরাতে! একরাতের জন্যে কোথাও বাসা বাঁধবার সময়ও ছিলনা, উৎসাহও নয়! কোনো রকমে আর একটা রাত কাটানো। চোখ বুজলেই সকাল। তারপর কলকাতা, কলকাতা! অভিশপ্ত শিলং, পংকিল শিলং, সুন্দর শিলং—তোমার কাছ থেকে নেবো বিদায়। দেখলাম কতো, শিখলাম কতো, জানলাম কতো তোমার কাছ থেকে। মনে থাকবে তোমায়!

উপরে উঠে দরজায় টোকা দিলাম।

হারিকেন হাতে হাসিমুখে দাঁড়ালো প্রে দরজা খুলে: আসেন, এতো দেরি?

অনেক কাজ ছিলো।

ঘরের ভিতরে গিয়ে খাটিয়ায় বসলাম। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলো প্রে: গিন্নী দিদির সাত্ দেখা হলো?

হ্যাঁ হলো। জুতো খুলতে খুলতে বললাম: একটু চা খাওয়াবে প্রে?

জরুর। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গেল প্রে। খানিক পরেই কং বেরিয়ে গেল বাইরে, ফিরে এলো একটু পরেই। হয়তো গেছলো দুধ বা

চিনি বা চা আনতে। জানিনে কি আনতে, জানবার আর ইচ্ছেই যেন হোল না। যতো না জেনে থাকা যায় ততই যেন ভালো। একখানা কাগজ নিয়ে মণিলালকে চিঠি লিখলাম ঃ

ভাই মণিলাল,

তোমার সঙ্গে দেখা না করেই অভদ্রের মতো চলে যেতে হলো ঃ কারণ আর থাকবার উপায় নেই, অনেক কাজ। আর তোমার আসারও কোনো ঠিক নেই। তোমার ঋণ শোধ করা অসাধ্য। কিন্তু ভাই চল্লিশটা টাকা রেখে গেলাম এই খামে, আমার হোটেল খরচ, চিকিৎসা খরচের দরুণ। জানি, রাগ করবে ; কিন্তু ঋণের বোঝা বাড়াতে মন চাইলো না। টাকা নিতে প্রে রাজি হয়নি মোটেই। তাই, তাকে লুকিয়ে এই ব্যবস্থা ! মনে কিছু করো না। আবার দেখা হবার আশা রাখি। ভালোবাসা জেনো। ইতি

তোমার প্রীতিধন্য

K.

চিঠিখানা আর চারখানা দশ টাকার নোট একসঙ্গে মুড়ে খামে ভরে ভাল করে বন্ধ করলাম। রাখলাম সেখানা নিজের কাছেই।

চা আনলো প্রে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললাম ঃ এবার কলকাতায় তোমার নেমন্তন্ন রইলো প্রে। যাবে তো ?

নিয়ে যাবেন তো, যাবে ঠিকই !

প্রের কথা শুনে হাসি পেলো ঃ আর না যাবে তো রেগে যাবো আমি, বুঝলে ? আর কলকাতায় যাওয়া তোমার বিশেষ দরকারও !

কেনো ?

কেন না, ভালো বাংলা বলতে এখনও শেখোনি। আর অনেক জিনিষও দেখতে পাবে। গঙ্গা নদী, হাওড়ার পোল, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, সিনেমা, থিয়েটার—হরেক রকম মজা।

খুশিতে উপচে পড়লো প্রে ঃ আমার কলকাতা যাবার বহুৎ ইচ্ছা। কিন্তু আপনার বন্ধু নিয়ে যাবেন? উহু।—আচ্ছা, উখানকার মেয়েরা লিখাপড়া জানে, গান জানে, নাচ জানে, না?

হুঁ।

রান্নাও জানে?

হুঁ হুঁ! মাংসের কালিয়া, ছানার পোলায়া, পেস্তার হালুয়া—বহুৎ রকম রান্না।

উ বাড়ীর গিন্নীদিদি ভি জানে!

ঠাট্টা করে বললাম ঃ তোমাকে খাইয়েচে বুঝি?…যাক শোনো, সতী কোথায়?

কংয়ের কাছে!

নিয়ে এসো এখানে!

প্রে কংকে ডাকলো সতীকে নিয়ে এ ঘরে আসতে!

সতীকে নিয়ে কং এলো ঘরে।

পকেট থেকে বার করলাম মুক্তোর মালা। বললাম ঃ ওকে নিয়ে এসো কাছে।

কং এগিয়ে এলো। পিট্ পিট্ করে চাইতে লাগলো সতী আমার দিকে! খাসিয়ানী মা, বাঙ্গালী বাপ—জানিনে, কেমন ওর ভবিষ্যৎ! গলায় পরিয়ে দিলাম মুক্তোর মালা, ঝুটো মুক্তোর মালা। নির্মল, শুভ্র, সুন্দর কিন্তু অপাংক্তেয়, সমাজের চোখে হেয়!

কেনো দিলেন উসব? প্রে বললো:

আমার খুশি!

আর কিছু বললো না প্রে। নরম গাল দুটো টিপে দিলাম সতীর। তাকে নিয়ে গেল কং।

এবার খামে মোড়া চিঠিখানা দিলাম প্রে-র হাতে: মণিলাল এলে দিয়ো!

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললো হেসে: বন্ধুকে এতো কি লিখলেন, মোটা চিঠি? আমাকে খুব গালাগালি?

হুঁ হুঁ! বললাম হেসে: লিখেচি, প্রে আমাকে কোনো যত্ন করেনি, ভালো করে খেতে দেয়নি, ঘুমোতেও দেয়নি!

প্রে বললো: ওঃ বহুৎ নালিশ তো? আমি বলবে, বাবু চলিয়ে গেল, সতীকে মালা দিলো, আর থাকবার টাকা ভি দিতে চাইলো!

বললাম: এ তো দেখচি অনেক নালিশ! না: মামলায় আমারই হার হবে দেখচি!

জরুর!

জরুর, সে আমিও জানি! বললাম: ঘরকা ম্যাজিষ্টর জরুর দিকে রায় দেবেনা তো আমার দিকে দেবে?

হো হো করে হেসে উঠলো প্রে!

পরদিন। বিদায়ক্ষণ। দুদিনের প্রীতির বাঁধন ছিঁড়তে হবে। আন্তরিক রসে ভেজা শক্ত বাঁধন!

জিনিষপত্র গুছিয়ে গাছিয়ে প্রস্তুত। এসেচে কুলি। যাবার সময় হলো।

চলি প্রে, কং চাল !

হঠাৎ হেঁট হয়ে প্রণাম করলো প্রে : মনে রাখবেন ছোটো বহিনকে !

চোখ দুটো প্রে-র সজল। কং নির্বাক। সতী হাতের মুঠি মুখে ভরেচে ; কংয়ের কোলে নিশ্চিন্ত সে !

চলুন দাদা, থোরা রাস্তা এগিয়ে দিই !

ভালোই তো !

কুলির মাথায় জিনিষ চাপিয়ে চললাম মোটর অফিসের দিকে ; সঙ্গে প্রে !

কোনো কথা নেই। বিদায় বেদনায় নির্বাক দুজনেই।

হঠাৎ থামলো প্রে : আচ্ছা, আমি যাই ! ঘুরলো প্রে, দ্রুত পায়ে চলে গেল বাড়ীর দিকে। হেঁচ্‌কা টানে ছিঁড়ে দিলো বাঁধন। বাঁধনহারা হলো তার অশ্রুধারা হয়তো।

যথাসময়ে মোটর অফিসে এলাম জিনিষপত্র নিয়ে। বাস ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই, হয়তো আর দশ পনেরো মিনিট। যাত্রীরা যে যার জায়গায় বসে। বাসের মাথায় মালপত্র গোছানো। বসলাম নিজের রিজার্ভ করা জায়গায়। পাইন দিয়ে সাজানো শিলং মন কেড়েছিল কখন জানিনে, বুঝলাম ফেরবার মুহুর্তে ! বিদায় ! কুবলাই শিলং। প্রে, কং, সতী, মণিলাল, প্রভা বিদায় !

প্রভা ! শিলংয়ের শ্যামল পট ভূমিকায় তুমি যে কালি লেপে দিলে, হে দ্বিচারিনি—জানিনে, তা মুছবো কেমন করে ? বিপথে চলা স্বামীকে সুপথে নিয়ে আসবার তপস্যাই করে এসেচে আমাদের বঙ্গ কুলবধূরা ! ধূপের মতো ক্রম-নিশ্চিহ্ন হয়েচে তারা, তবু সতীত্ব সৌরভ ছড়াতে তারা কার্পণ্য করেনি—এই দেখতেই তো আমাদের প্রাচ্য চোখ দুটো অভ্যস্ত !

আজ হোঁচট খেলাম এই প্রস্তরময় শিলংয়ে। নরম মাটির মেয়ে হয়েও তুমি বঙ্গবধূ, ধৈর্য ধরলে না, ধরলে না তোমার অধঃপতিত স্বামীর রাশ! তুমি তার পথ রোধ না করে ধরলে অন্যপথ! দেহের টানই তোমার বড় হলো, প্রাণের টান কোনো দামই পেলে না তোমার কাছে!

আজ তোমার আর মণিলালের বিপরীতমুখী দেহের তাগিদে তোমাদেরই দেহজ সন্তানেরা বিপদের সম্মুখীন—সংসার ভগ্নপ্রায়! রঙ্গমঞ্চে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় শুধু! নেপথ্যে ভালোবাসার বাসা দুজনেরই আলাদা।

শিলং ছাড়বার আগে প্রভার কাছে খেলাম মানসিক ধাক্কা।

হঠাৎ দেখি মোটর অফিসের দিকে ছুটে আসচে একটা ছেলে। ভালো করে চেয়ে দেখি, মণিলালের বড় ছেলেটি। একধারেই বসেছিলাম, তাড়াতাড়ি নামলাম বাস থেকে, ছেলেটি দাঁড়ালো আমার সামনে; আমার হাতে দিলো একখানা মোটা বন্ধ খাম:

মা দিয়েচে!

মা কোথায়? জিগ্যেস করলাম।

পেছন ফিরে আঙুল দিয়ে দেখালো: ঐ রাস্তার মোড়ে!

চলে গেছেন মা?

না, দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গেই তো ফিরে যাবো বাড়ী।

হাত ঘড়িটায় দেখলাম, আর মাত্র দু'তিন মিনিট সময় বাকি বাস ছাড়তে। ড্রাইভারকেও জিগ্যেস করে জানলাম, আর বেশি সময় নেই, এখুনি ছাড়বে বাস!

না, দেখা করা যাবে না প্রভার সঙ্গে। আর দেখা করা দরকারই বা

াক ? কিন্তু চিঠি দেবার কি দরকার হলো তার ? আর একবার চাইলাম রাস্তাটার মোড়ের দিকে। না, দেখা গেল না প্রভাকে। দেখা দিতে চায় না সে। নইলে সে নিজেই আসতে পারতো !

বললাম ছেলেটিকে : আচ্ছা, তুমি যাও মায়ের কাছে, আমি চলি, কী বলো ?

আচ্ছা।

তার মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বললাম : কুবলাই।

কুবলাই। মিটমিট করে হাসলো সে।

শুরু হলো বাস চলা। খাম খুলে শুরু করলাম পড়া, কাঁচা হাতের লেখা, তবে পাকা বাঁধুনি তার প্রতি কথায় :

কী বলবো, মান্যবরেষু ? শ্রদ্ধাস্পদেষু ? প্রীতিভাজনেষু ? বরং সবিনয়ে নিবেদন, বলা যাক্ !

দোষী যখন, বিনয় না থাকলে বেমানান লাগে ; আর আবেদন-নিবেদন না থাকলে তো দরখাস্ত না-মঞ্জুর। অতএব হে ধর্মাবতার, এই পাপিয়সীর আবেদন পত্র যেন অগ্রাহ্য না হয়।

পাপিয়সী কথাটা বেশ ! না ? কেমন নাটকীয় ! গালভরা। পাপিষ্ঠা কথাটা কেমন খট্‌মটে, ওষ্ঠে আটকে যায়, বলতে না বলতেই শেষ ! তাই পাপিয়সীরা লোক চক্ষু আকর্ষণ করে বেশি। আপনার চক্ষুও, জানি মন নয়, আকর্ষণ করেচে এই পাপিয়সী !

আমার কথা আপনাকে জানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। পাপিয়সী যদি আপনার চোখে হয়ে থাকিই, হ'লামই বা, ক্ষতি

কি ? ক্ষতি আপনারও নেই, আমারও নেই। বলবার আপনারও নেই কিছু, কৈফিয়ৎ দেবারও কিছু দরকার নেই, জানি আমি। তবে কেন লিখচি ?

লিখচি আমার জন্যে নয়, আমার জাতের জন্যে, মেয়ে জাতের জন্যে ! আমার উপর খারাপ ধারণা নিয়ে যান, ক্ষতি নেই —কিন্তু আমাকে দেখে মেয়ে জাতের উপর ভুল ধারণা নিয়ে যাবেন, এত বড় অন্যায়, অবমাননা অসহ্য, সংশোধনীয় !

এই মেয়েদেরই এমন একটা দিন গেচে যখন দিনের আলোর সঙ্গে দেখা হওয়াই ছিল ভার। দিনে রান্নাঘর আর রাত্রে শোবার ঘরই ছিল তাদের জীবনের আনা গোনার দুটো আস্তানা। রান্নাঘরে ব্যবস্থা ছিল বহুজনের পেটের খিদে মেটাবার ; আর শোবার ঘর ছিল একজনের দেহের খিদে মেটাবার জন্যে। অবশ্য সেই 'একজন'— পরম গুরু পতির যদি খেয়াল বা সময় হতো, তবেই সেই ভাগ্যবতী সেবিকা পেতেন সুযোগ দেহে মনে প্রাণে পতি সেবা করতে। নইলে তাকে শোবার ঘরে বালিশ আঁকড়ে পড়ে কান পেতে শুনতে হতো বার-মহলে বাঈজীর নাচের ঘুঙুর বোল ! মদের বোতলের ঠুং-ঠাং, গেলাসের টুং-টাং, আর সেই সঙ্গে ভালো ভালো গালাগালির ভাঙা ভাঙা কথার টুকরোও যে কানে আসতো না, তা নয় ! তাতে সেই পরম-গুরু-সেবিকার চোখে ঘুম আসতো না নিশ্চয়ই, কিন্তু কি আসতো বলুন তো ? পারবেন, পুরুষ আপনি, বলতে ?......কান্না ! সত্যি, তখন নারীর ছিল ঠুনকো সতীত্ব, আর পুরুষের ছিল অসীম তেজ !

হায়, আপনাদের সেই সোনার খাঁচার দিনগুলি, আজকের

ভাঙা খাঁচায় ঝট্‌পট্‌ করে মরচে। কালের দরবারে পুরুষের তেজ, একদম খারিজ! দমবন্ধ হওয়া মেয়েগুলো কালের ঝাপটা হাওয়ায় বুক ভরে নিলো নিঃশ্বাস; আর বিশ্বাস করতে চাইলো না পুরুষ জাতকে; কৈফিয়ৎ চাইলো পুরুষের কর্মের, অপকর্মের। পুরুষ উঠলো আঁৎকে!

এমনি যখন কালের গতি, আপনার বন্ধু করলো ভুল। তিন পুরুষ আগেকার পুরুষের রক্ত হয়তো চনমনিয়ে উঠেছিল তার রক্তে—তাই আমার তকৃত খালি দেখেই ফট্‌ করে সেখানে অভিষেক করলো আর এক হৃদয়-রাণীকে।

আগে পুরুষের হৃদয়ে পাতা থাকতো বেঞ্চ, পাশাপাশি হৃদয়রাণীরা বসতো সেটায় ঠাসাঠাসি করে। পাটরাণী সেজে ঠাট দেখাবার যো ছিল না কারো। অবশ্য পরম গুরু খেয়াল খুশি মতো, বেঞ্চ থেকে উঠিয়ে কাউকে মাথায় তুলে নাচাতেন, কাউকে পায়ে দলে চেঁচাতেন।

ক্রমেই পুরুষানুক্রমে পুরুষের বুকের পাটা হয়ে এলো ছোট, বেঞ্চ পাতার জায়গা রইল না সেখানে। পাততে হলো সিংহাসন —মাত্র একখানি, একজন হৃদয়-রাণীর জন্যে! সেখানে যে দুজন বসবার জায়গা নেই, আর থাকলেও বসতে চায় না দুজনে— আপনার সেকেলে বন্ধুর বোধ হয় তা জানা ছিল না!

পুরুষের হাতের সেকেলে কাঠের পুতুল কালের হাওয়া পেয়ে কখন যে কাল-কেউটে হয়ে গেচে—বেচারি তা বুঝে উঠতে পারেনি! অনেকেই তা পারে না। ল্যাজে পা পড়লে যন্ত্রনায় আগে যারা হু-হু করে কাঁদতোই শুধু, এখন তারা ফুঁসে উঠে হস্‌-

হস্ করে। এ হুঁসটুকু পুরুষদের থাকা দরকার। হুঁসিয়ার হবার দিন এসেচে পুরুষদের।

দেহের কামনা যেমন পুরুষের আছে—মেয়েদেরও আছে তেমনই। মুখ ফোটে না ব'লে, বুকে কামনার ফুল ফোটে না বুঝি? ফুলের মত আমরা ফুটি মালেকের ফুলবাগানে। তার মাটিতেই ফুটি বটে, তার রসেতেই রূপ আমাদের, গন্ধ আমাদের! সে যদি ভ্রমর হয়ে আসে বুকে, মধু দিই তো উজার ক'রে। আর যদি সে চলে যায় অন্য ফুলে—অন্য ভ্রমর আসবেই তো ফেলা ফুলের রূপে এবং গন্ধে ম'জে!

পুরুষের হৃদি-সিংহাসনে একজন থাকতেই আর এক জনকে সেখানে হাত ধরে বসাতে চায় পুরুষ। মেয়েরা তা চায় না বটে, তবে তার হৃদি-সিংহাসন খালি দেখলে অনেক পুরুষই সেখানে বসবার জন্যে লোলুপ হয়ে ওঠে। আর কাউকে চোখের সামনে সর্বদাই ঘোরাফেরা করতে দেখলে, কিংবা ঠাই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে—কোনো দুর্বল মূহুর্তে তাকে যদি সিংহাসনে বসবার ঠাঁই করে দেয়ই—তবে দোষ দেওয়া যায় কি করে?

আমার অবস্থাও হলো তাই। বন্ধু আপনার নতুন বধূয়া নিয়ে বুঁদ হয়ে রইলেন, ভাবলেন তার পুরোন বধূর হৃদয় দুয়ার বুঝি বন্ধই! বন্ধই রেখেছিলাম, কিন্তু হাঁপিয়ে উঠলাম। বিশেষ করে ফাঁকা ঘরে একলা থাকা দায়! এমন সময় সামনে দেখি ঐ ঐ যাকে দেখলেন। খুললাম দরজা, ধরলাম ওর হাত, বললাম: এসো ভেতরে এসো, বসো। প্রথমে ভয় পেলো—যেমন লোকে ভয় পায় অন্যের ফুল বাগানে ঢুকতে; পরে রাজী হলো।

আমি চেয়েছিলাম মনে সখ্যতা, ও চাইলো দেহ-ভিক্ষা। আমি বন্ধুত্বের হাত এগিয়ে দিতেই, স্থূল পুরুষ ও, দুহাত বাড়িয়ে দেহ ধরলো জড়িয়ে। নতুন পুরুষের স্পর্শে অভিমানী দেহ হলো উদ্দাম, রক্ত উঠলো নেচে, মনও।

আমরা ডুবলাম কামনার পংকে।

আর পারা গেল না পড়তে। চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগলো। অভিশপ্তা নারীর স্বীকারোক্তি। সরল, সহজ, নির্মম সত্যে ভরা! অনুতাপের লেশ মাত্র নেই, নেই প্রতিহিংসার বিষাক্ত বাষ্প! পুরুষ ও প্রকৃতির মাঝে প্রাকৃতিক সম্ভাবনা যা অবশ্যম্ভাবী তাই যেন সে মেনে নিয়েচে। স্বীকার করেনি প্রাকৃতিক নিয়মের অনিয়ম!

মন চায় না, সায় দিতে; কিন্তু হায় চোখ রাঙাই বা কেমন করে? পরম সত্যকে কেমন করে ঢাকি বলো অজানার অছিলায়?

এখন বুঝচি, এ ব্যাপার অজানা নয়, মণিলালের কাছেও! নিজে দোষী হয়ে অন্য দোষীকে চোখ রাঙাবার মত নির্লজ্জতা বা সাহস মণিলালের নেই বলেই গুমরে মরচে মনে মনে, প্রতিকারের পথ পাচ্চে না খুঁজে! তাই ভুলে থাকতে চায় মদের মাদকতায়। লালসার পংকে দুজনেই আকণ্ঠ ডুবে, কে কাকে ওঠাবে হাত ধরে?

আমি কী করি? এমনি করেই কি দেখবো ওদের ডুবে যাওয়া, ভেসে যাওয়া নিষ্পাপ শিশু ক'টির? দুজনেরই ভুলের পংক থেকে ফুটবে না কি পংকজিনী? দুটি খরতালের আঘাতে যেমন বেজে ওঠে মধুর ধ্বনি তালে তালে—তেমন কি দুটি ভুলের আঘাতে যাবে না খুলে মনের দুয়ার, নেবে না

তুলে এ-ওকে কুলে ?

নিতেও তো পারে। এ সংসারে দুর্ঘটনাই ঘটবে শুধু, সুঘটনা নয় ? মানুষ শুধুই কাঁদবে বসে, হাসবে না ?

হঠাৎ, ঝাঁকানি খেলাম জোরে। বাসটা গেচে থেমে! নিজেকে যেন ফিরে পেলাম। চোখ ফিরিয়ে দেখি, সেটা বাসের ক্রশিং! সিলেট-শিলং যাওয়া আসার পথে তাদের দেখাশুনা হয় এখানে। পাইন্থরউস্‌লা! চমৎকার দৃশ্য! মিলনেরই জায়গা বটে!

নামলাম বাস থেকে। ঠাণ্ডা হাওয়া! নরম রোদ। মাথার উপরে উড়ে যাওয়া সাদা মেঘ। খাসিয়ানীদের পানের দোকান, চায়ের দোকান। যাত্রীদের ভীড় সেখানে। পাহাড়ীরা বসেচে পাহাড়ী ফল নিয়ে।

আধঘণ্টা সময়। কাছেই হালফ্যাসানের রেষ্টুরেন্ট! চেয়ার টেবিল পাতা। মাখন, রুটি, কলা, মধু, চা, যা চাও পাবে। বসলাম গিয়ে সেখানে।

কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্চে, পথের দুদিক থেকে বাসগুলো এসে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। দুই সহর থেকে ওরা এসেচে। পংকিল সহর থেকে ওরা এসে মিলেচে এই অনাবিল আবহাওয়ায়। পথের কত না বিপদ, কত না বাঁক পার হয়ে এসেচে—তবেই না এই দেখা শোনা, এই মিলন।

বাবু, চা রোটি ?

হ্যাঁ, দেও।

এমনি করে মিলবে না ওই প্রভা আর মণিলালে? দুজনেই গেচে দূরে সরে—কেমন করে মিলবে আর? মিলের পথে অনেক বিপদ, অনেক বাঁক।

হোক্ না বিপদ, বিপদ যখন ঘাড়েই চ'ড়ে? হোকনা বাঁক, ফাঁক যখন দুইয়ের মাঝেই। ধাক্কা দিই মণিলালকে, যায় যদি যাক প্রভার কাছে।

বাবু, চা।

রাখো।

হাতের স্যুটকেশ থেকে বার করলাম কাগজ, কলম ঃ

মণিলাল,

তোমার স্ত্রীর কথা বলতে গিয়েও যা বলোনি তা বলেচে তোমার স্ত্রীই অকপটে, এই চিঠিতে। এ চিঠি আধুনিক পুরুষদের পুরোন ঠুলি খোলাবার পক্ষে যথেষ্ট—তোমার পক্ষে তো বটেই। ক্ষতি তোমার এতই, যে আর হবার ভয় নেই; এই ভরসায়, তোমার উপকারের আশায়, চিঠিখানি তোমার কাছে পাঠানো দরকার মনে করলাম আমিই। এই চিঠি হয় তোমার ভাঙা সংসারকে বেঁধে দেবে—নয়তো হাহাকার করে ফিরবে শিলংয়ের পাইনের হাওয়ায়, ব্যর্থতায়। মনে করি, বন্ধুত্বের কাজই করলাম, শত্রুতা নয়। ইতি—

বাবু, জলদি কিজিয়ে, টাইম বহুৎ কমতি।

ঠিক হায়।

ঘড়ি দেখলাম। বাস ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট। টিকিট আঁটা খামে ভরলাম প্রভার চিঠি, আমার চিঠি। আঁটলাম খাম। মণিলালের অফিসের ঠিকানা লিখলাম গায়ে। সামনেই ছোট্ট ঝোলানো ডাক বাক্স। লাল।

ডাকবাক্স। তুমি তো জানো এই পৃথিবীতে কত হাসি কত কান্না। কত ত্যাগ, কত স্বার্থ কত কিছু তুমি রাখো গোপন করে—অথচ তোমার কাছে তো কিছুই গোপন নেই। তোমার মাধ্যমে কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ ভয় পায়। কিন্তু তুমি শুধু—লোকের আশা আকাংখা, ভালবাসা, অভিমান, নালিশ—যাকে যা জানাবার জানিয়েই তোমার কর্তব্য করো শেষ। তাই ওগো কর্তব্যপরায়ণ নীরব কর্মি, তোমার কাছেই সমর্পণ করলাম অভিমানে ভুল পথে যাওয়া এক নারীর নির্মম সত্য বক্তব্য, আর সেই সঙ্গে আমার ছোট্ট মন্তব্যটুকু। পৌছে দাও বন্ধু, এই সত্যটুকু ঐ পুরুষের কাছে যে করেচে প্রথমে ভুল, যে করচে আজো ভুল আর করচে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

জানিনে, এ লিপি তার সামনে দেখা দেবে বিষধর সাপ হয়ে, না, মিলনের মালা হয়ে। তার বিধিলিপির কথা কে বলবে?

তবু তোমার আমার দিয়ে, ও যদি বোঝে বুঝুক ভুল, ভাঙা ভিটের আবার ফুটুক ফুল।

চিঠিখানা ফেললাম ডাকবাক্সে।